মেয়ের বাপ।

(উপন্যাস)

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট বুধোদয় প্রেস হইতে
শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
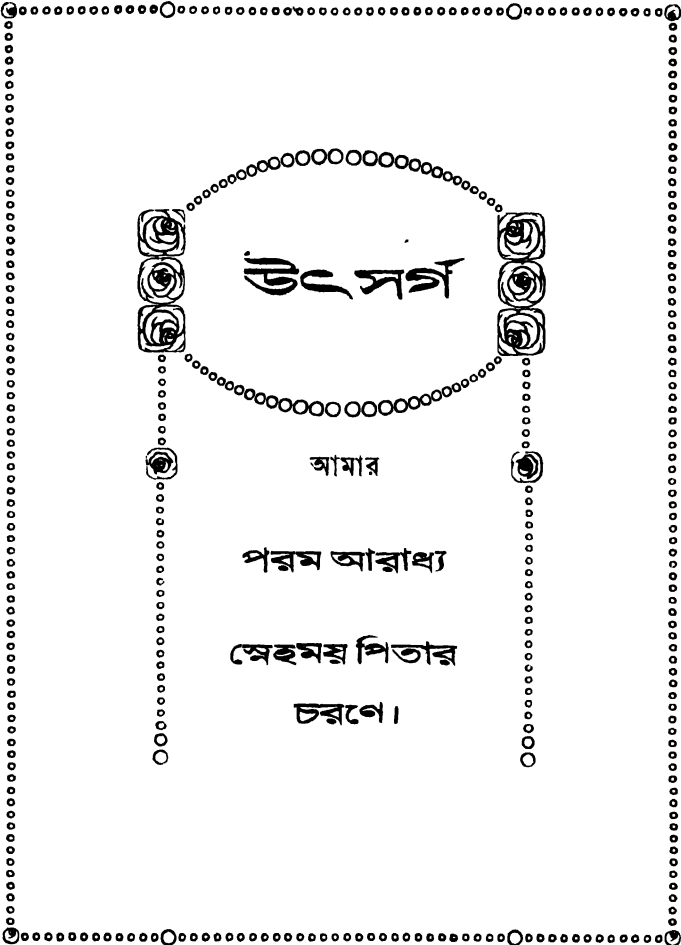
৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভূদেব পাবলিসিং
হাউস হইতে শ্রীকুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

উৎসর্গ

আমার

পরম আরাধ্য

স্নেহময় পিতার

চরণে।

ভূমিকা।

এই বইখানি আমাদের বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য মেয়ের বাপগুলির দুঃখে সাহানুভূতি জ্ঞাপনার্থে প্রকাশিত করিলাম।

লেখিকা।

অম্বলা, পাঞ্জাব।

১৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

মেয়ের বাপ।

এক।

"মা গো মা! এখনো পড়ান হচ্ছে? নাঃ, ঠাকুরঝি আমাদের ছেলেকে একটা জজ ম্যাজিষ্টর না করিয়ে আর ছাড়ছে না দেখছি!"

শীতের স্বল্পস্থায়ী ছোট্ট বেলা, গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া মাধ্যাহ্নিক অবসরে অন্নপূর্ণা তাঁহার অষ্টম বর্ষীয় পুত্র সুধীরকে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন। ভ্রাতৃজায়া নীরদা হাসিমুখে পরিহাসের ভাবে বলিলেও কথাটা সেই সদ্য বিধবার শোক ক্ষীণ; ব্যথিত অন্তরে একটু বিশেষরূপেই আঘাত করিল।

অন্নপূর্ণা ক্ষুব্ধ চিত্তে মলিন মুখে উত্তর করিলেন "জজ ম্যাজিষ্টর হবার অদৃষ্টই হতো যদি, তা'হলে এই বয়সে ওর কপালই বা ভাঙ্গবে কেন ভাই? তোমার ঠাকুরজামাইয়ের যে বড় সাধ ছিল, সুধীরকে লেখাপড়া শিখিয়ে একটা মানুষের মত মানুষ করে তুলবেন, তা সে সাধতো তাঁর মিটল না—"

স্নেহময়ী ননন্দাকে অতর্কিতে ব্যথা দিয়া অপ্রতিভ নীরদা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল "ঐ দেখ, কি কথায় কি কথা এসে পড়ল! কেমন ভোলা

মন আমার! বলি ছেলেটাকে আর কতক্ষণ ধরে রাখ্‌বে ঠাকুরঝি, এইবার ছেড়ে দাও না, বেচারা একটু খেলা করে বাঁচুক। তুমিও একদণ্ড জিরেন পাও। একে এই সৃষ্টি সংসারের খাটুনি, তার ওপর আবার মাষ্টারী করা! তুমি কিন্তু ধন্যি মেয়ে ঠাকুরঝি! শরীরে এতটুকু আলিস্যি নেই?”

অন্নপূর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিলেন “আলিস্যি করলে কি চলে ভাই?”

“নাঃ! তাকি আর চলে? নিজেই তো আমাকে কোনও কাজে হাত দিতে দেবো না, তা আর কি হবে বল?”

“তোমার যে মহাকাজ আছে ভাই, তাই আগে সামলাও, খুকীটা ঘুমিয়েছে বুঝি? তাই এত বিক্রম দেখান হচ্ছে? জাগিয়ে দেব তাকে?”

“না ভাই! রক্ষে কর! সত্যি ঠাকুরঝি, তুমি রয়েছ তাই, নইলে ঐ জন্মরোগা ঘ্যান্ ঘেনে প্যান্ পেনে মেয়েটাকে নিয়ে আমি যে কি ছর-কোট্ করতুম, তা বলতে পারি না।”

সুধীর এতক্ষণ বই হাতে চুপ চাপ করিয়া মাতা ও মামীমাতার কথোপকথন শুনিতেছিল, কিন্তু তাহার বড় আদরের ছোট বোনটার নিন্দা আর সহিতে না পারিয়া সে বলিল “কেন মামীমা, খুকী তো বড় লক্ষ্মী মেয়ে, আমার কোলে কেমন চুপ্‌টী করে থাকে, কাঁদবার নামও করে না।”

নীরদা সহাস্যে কহিল “সত্যি বাবা, তুই যে কেমন করে ঐ দুর্দ্দান্ত মেয়েটাকে এমন বশ করে নিলি, তা ভেবেই পাই না। যতই বায়না ধরুক, ঐ সুধীর আসছে বল্লেই অমনি চুপ হয়ে যায়। আশ্চর্য্য ক্ষমতা তোর কিন্তু।”

মেয়ের বাপ।

নীরদা সুধীরের কাছে আসিয়া তাহার মাথা ভরা এলোমেলো কোঁকড়ান চুলগুলি সযত্নে গুছাইয়া দিতে লাগিল।

সুধীর ছেলেটী বড় সুন্দর। গৌরবর্ণ দোহারা সুগঠিত শরীর, প্রতিভা ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ধীর প্রশান্ত চক্ষু দুটী, উন্নত নাসিকা, এক কথায় ছেলেটীকে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। নীরদা তাহার প্রশস্ত ললাটের উপর ঝুলিয়া পড়া চুলের গোছা সরাইয়া দিয়া সস্নেহে বলিল "ঠাকুরঝি, আমি বলছি তোমার ছেলে সত্যি একজন মস্ত বড়লোক হবে, দেখছ না কি মস্ত কপাল! আর এই দেখ রাজদণ্ডও রয়েছে।—"

বালকের রেখাহীন নির্ম্মল ললাটের মধ্যস্থলে যে একটী নীলাভ শিরা স্পষ্ট জাগিয়াছিল, সেইটী দেখাইয়া নীরদা এক মুখ হাসিয়া সানন্দে বলিল "তোমার ছেলে নিশ্চয় রাজা হবে ঠাকুরঝি,—আর তুমি রাজমাতা হবে, তখন এই 'ক্ষুদ চাটা' ভাজটীকে যেন ভুলে যেও না ভাই!"

বিস্ময়াবিষ্ট পুত্রের দিকে কল্যাণবর্ষী করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মাতা মমতার্দ্র পুলকিত কণ্ঠে কহিলেন "তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ কর ভাই, ও বেঁচে থাকুক, ওকে রেখে যেন আমি যেতে পারি, আর কিছুই চাই না।"

সুধীর এবার মামীমার হাতখানা কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "মামীমার কথা শোন কেন মা তুমি? মামীমা এক পাগল! মানুষের কপালে নাকি দণ্ড লেখা থাকে? দণ্ড মানে তো সাজা, আমি কি দোষ করেছি যে আমার কপালে দণ্ড লেখা থাক্‌বে, হ্যাঁ মামীমা?"

বালকের সরলতা ও অর্থবোধ জ্ঞান দেখিয়া মামীমা ও মা দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন। মাতা স্নেহ প্রফুল্লমুখে কহিলেন "এ সে দণ্ড নয় রে পাগল! রাজদণ্ড, তুই রাজা হলে কিন্তু তোর মামীমাকে সোণার খাটে গা, আর রূপোর খাটে পা করে খুব আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে দিবি, বুঝলি? ওমা, কথায় কথায় বেলা গেল যে, কটা বাজ্‌ল বউ?"

"আমি এ ঘরে এলুম, তখন তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট—"

"তা হলে চারটে বাজে বল, আমি উঠি, এখন দাদার আসবার সময় হল যে।"

"বই শ্লেট সব গুছিয়ে রেখে তুমি এখন খেলা করগে সুধীর।" নীরদা বলিল "সুধীরকে স্কুলে দাও না ঠাকুরঝি, তা'হলে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হয় না। তোমার দাদাও সেদিন তাই বলছিলেন।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না বউ, অন্ততঃ বছর খানেক যাক্ আরো, আর একটু সেয়ানা হ'ক, তার পর স্কুলে তো দিতেই হবে। উনি বলতেন ছেলেদের প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছেই হওয়া উচিত। তা আমার যা বিদ্যে তা'তে আর বেশীদিন ঘরে পড়ান চলবে না তো।"

নীরদা বলিল "এতটা বিদ্যেই বা আমাদের গেরস্ত ঘরে ক'জনের আছে বল? আমার মত গোমূখ্যু মা হলেই তো চিত্তির। নিজেই জানে না, তা আবার ছেলেকে শেখাবে!" বলিতে বলিতে নীরদা হাসিয়া উঠিল, বলিল "সত্যি ঠাকুরঝি, ঘরকন্নার ছিষ্টিকাজের মধ্যে তুমি যে এত লেখাপড়া শিখ্‌লে কি করে তাই আশ্চর্য্য হই। ঠাকুর জামাইয়ের মাষ্টারী করা কিন্তু সার্থক হয়েছে!"

অন্নপূর্ণা প্রসন্নস্মিত মুখে বলিলেন "তিনি যত্ন করে শিখিয়েছিলেন, তাই এখন আমার কাজে আসছে ভাই, নইলে এই এতটুকু ছেলের জন্য আবার মাষ্টার রাখতে হত।"

"কিন্তু দুটীবেলা হাঁড়ী ঠেলে আবার ছেলে পড়ান, এ তুমিই পারছ ভাই, আমাদের গতরে তো কুলিয়ে উঠত না। ঘরের কাজে একটুখানি অবকাশ পেলে দুদণ্ড গড়িয়ে বাঁচি, এর ওপর আবার লেখাপড়ার হাঙ্গামা করে কে?"

"হাঙ্গামা না করলে চলে না যে ভাই, আমাদের ঘরের কাজ তো নিজের কাজ, কিন্তু পুরুষদের দেখ দেখি, পরের কাজ নিয়ে তাদের কি রকম মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা খাইতে হয়, তাদের তুলনায় আমাদের ঘরের কাজ তো কিছুই নয় ভাই!"

নীরদা মৃদুহাস্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল "কি জানি বাপু, আমি মুখ্যুস্যুখ্যু লোক, অত শত বুঝিনে। তাই তো তোমার দাদা যখন তখন বলেন তুমি অনুর কাছে বুদ্ধি নাও। ঐগো মেয়েটা উঠ্‌ল বুঝি?" সদ্য নিদ্রোত্থিতা খুকীর কান্নার শব্দ পাইয়া নীরদা তাহার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

অন্নপূর্ণাও উঠিয়া ভ্রাতার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে পাকশালায় গমন করিলেন।

দুই।

সুধীরের পিতা সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আলিগড়ে গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। বেতন অল্প হইলেও দুটী প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে তাহা যথেষ্ট ছিল। বিশেষতঃ সুশীলা লক্ষ্মীস্বরূপা সহধর্ম্মিণীর গুণে সুবোধচন্দ্রের ক্ষুদ্র সংসারে কোনও প্রকার অভাব বা অনাটন দেখা যাইত না। অন্নপূর্ণাকে স্ত্রীরূপে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সুবোধচন্দ্র আপনাকে বড় সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিতেন। অন্নপূর্ণারও তাঁহার মত সুশিক্ষিত দেবচরিত্র স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া গৌরবের ও সুখের সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহার উপর দেবতার নির্ম্মাল্যের মত সুস্থ সুন্দর শিশু সুধীরকে কোলে পাইয়া সেই সুখী দম্পতীর সুখের মাত্রা যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখ বুঝি মানবের ভাগ্যে সত্যই সহে না। তাই বড় আদরের একমাত্র পুত্র এবং অনুগতা প্রিয়তমা পত্নীকে অসহায় অনাথ করিয়া সুবোধচন্দ্র বড় শীঘ্র, বড় সহসা চলিয়া গেলেন সেই সুদূর অজানা অপরিচিত রাজ্যে, যেখানে গেলে একান্ত আগ্রহ ও ইচ্ছা সত্বেও মানুষ আর ফিরিতে পারে না; নশ্বর জগতের সমস্ত সুখ দুঃখের অতীত সেই দেশ, শোকাতুরের আর্ত্তকরুণ হাহাকার, প্রাণাধিক প্রিয়জনের বুকফাটা ব্যাকুলতার অবিরল তপ্ত অশ্রুধারা, সে দেশবাসীর কুলিশ কঠিন নির্ম্মম চিত্তে এতটুকু স্পর্শও করিতে পারে না। কালের আহ্বান বড় অসময়ে অতর্কিতে আসিয়া ছিল, তাই সুবোধচন্দ্র স্ত্রীপুত্রের

অসহায় জীবন যাত্রার সম্বল কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং বিধবা হইয়া অন্নপূর্ণাকে অভিভাবকহীন অবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া একমাত্র ভ্রাতার অস্বচ্ছল সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। অন্নপূর্ণার জ্যেষ্ঠ অবিনাশচন্দ্র গাজিপুরে আহিফেন বিভাগে কাজ করিতেন। বেতন যাহা পাইতেন, তাহা একটা সংসার প্রতিপালনের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে, তবে সে অঞ্চলে তখনও গৃহস্থের নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুলভ ছিল, তাই সাধারণ জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত না।

অবিনাশ বাবুর প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় গত হইয়াছিলেন, নীরদা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যা। নীরদার কোলে একটী বছর দেড়েকের কন্যা।

অকাল বৈধব্যক্লিষ্টা, শোক বিধুরা ভগিনী ও পিতৃহীন অনাথ বালক সুধীরকে অবিনাশ বাবু অতি সাদরে গ্রহণ করিলেও নীরদা তাহা পারে নাই। তাহাদের নিত্য অভাবগ্রস্থ অনাটনের সংসারে আবার দুটী অতিরিক্ত প্রাণীর আবির্ভাব প্রথম প্রথম নীরদাকে বিলক্ষণ বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহার এ ধারণা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হইল। সে যখন দেখিল যে অন্নপূর্ণার মত স্নেহশালিনী, গৃহকর্ম্মনিপুণা, ধীর সংযত স্বভাবা ননন্দা ঘরে থাকিলে লোকসান অপেক্ষা লাভের ভাগই অধিক, তখন নীরদার বিমুখ মন আপনা হইতেই প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে ননন্দার একান্ত বাধ্য ও অনুগতা হইয়া পড়িল।

মায়ের মত শান্ত ও নম্র স্বভাব সুধীরও নিজ গুণে অল্পে অল্পে তাহার

রুক্ষা প্রকৃতি মামীমাতার স্নেহ ও মমতা আকর্ষণ করিয়া লইল।

সেই অবধি অন্নপূর্ণার হাতে সংসারের সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া নীরদা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে সুখে দুঃখে কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। নীরদার সেই চিররুগ্ন মেয়েটী, এখন নীরোগ সুস্থ শরীরা, সুশ্রী বালিকা, তাহার নাম পুষ্পরাণী। ইতিমধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র শিশুকন্যা নীরদার শূন্য ক্রোড় অধিকার করিয়াছে।

সুধীর এখন স্থানীয় বিদ্যালয়ে নাইন্থ ক্লাসে পড়িতেছে, সে ক্লাসের মধ্যে সকলের সেরা ও মেধাবী ছাত্র।

ফাল্গুনের শেষ। পশ্চিমের ভীষণ শীতের জড়তা কাটাইয়া মধুর দখিণা বাতাসে মানুষ একটু হাত পা নাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

আজ একাদশী। সারাদিনের গুরুতর পরিশ্রম ও উপবাসে ক্লিষ্টা অন্নপূর্ণা তাহার শয্যার উপর একখানি মোটা র‍্যাপার গায়ে দিয়া শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি বেশ গভীর হইয়াছে।

ঘরের একটী পাশে বসিয়া বিনিদ্র সুধীর একটা ভাঙ্গা টিপয়ের উপর হেরিকেন রাখিয়া আসন্ন পরীক্ষার জন্য পাঠ মুখস্থ করিতেছিল। মাতাকে নিদ্রিত মনে করিয়া সুধীর তাঁহার দিকের আলোতে একটা মোটা কাগজের সেড্ দিয়া দিয়াছে।

বাস্তবিক অন্নপূর্ণা তখনও ঘুমাইতে পারেন নাই। উপবাস আজ নূতন নহে, কিন্তু আরও একটা কি কষ্ট ও অস্বস্তির ভাব উপবাসের অবসাদ ও গ্লানিকে ছাপাইয়া অন্নপূর্ণার শ্রান্ত চক্ষে নিদ্রা দুর্ল্লভ করিয়া তুলিয়াছিল। খানিক পরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি

অধ্যয়ন নিমগ্ন পুত্রের পানে চাহিয়া স্নেহসিক্ত কোমল কণ্ঠে কহিলেন "রাত যে ঢের হয়েছে বাবা, শোবে কখন ?"

সুধীর হাতের বইখানা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল "তুমি এখনো জেগে আছ মা ? আমি বলি ঘুমিয়েছ।"

"না বাবা, আজ আর পোড়া চোখে ঘুম আসবে না, শরীরে স্বস্তি নেই কি না।"

"স্বস্তি আর থাকে কি করে ? সারাদিন নির্জ্জলা উপোস গেছে। রসো মা, আমি এখনি এসে তোমার গা হাত পা টিপে দিচ্ছি, তাহলেই ঘুম এসে যাবে।"

"না বাবা, তার আর দরকার নেই, তুই এখন শুয়ে পড়বি আয়, বেশী রাত জাগলে অসুখ করবে।"

কিন্তু সুধীর শুনিল না। সে ল্যাম্পের বাতিটা কম করিয়া মায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে হস্তার্পণ করিয়াই চমকিয়া উঠিল। উদ্বিগ্ন মুখে ত্রস্তে বলিল "তোমার জ্বর হয়েছে নাকি মা ! গা এত গরম কেন ?"

"জ্বর ? কই তাতো বুঝতে পারছি না, হয়তো একটু হয়ে থাক্‌বে, তাই এত শীত ধরেছে। ঐ বাঁশের আল্‌নার ওপরে লেপ-খানা তোলা রয়েছে, পেড়ে আমার গায়ে চাপা দিয়ে দিবি বাবা ?"

লেপখানি পাড়িয়া মাতার সর্ব্বাঙ্গে বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিয়া সুধীর বলিল "তোমার জ্বর হ'ল কেন মা ! একবার মামীমাকে ডেকে আন্‌ব ?"

অন্নপূর্ণা আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "না বাবা থাক্, ওরা সব ঘুমিয়েছে, কেন আর বিরক্ত করা। জ্বরটা সকাল নাগাৎ আপনিই ছেড়ে যাবে, তার জন্যে ব্যস্ত হস্ নে।"

কিন্তু সুধীর সুস্থির হইতে পারিল না, কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার কোমল চিত্তখানি উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইতিপূর্ব্বে মাকে অসুস্থ হইতে সুধীর বড় একটা দেখে নাই, তাই জ্বরটা বেশী না হইলেও সে বিশেষ চিন্তিত হইল। আজ অনেক দিন পরে সুধীরের মনে পড়িল তাহার পিতার অন্তিম দৃশ্য। এই সর্ব্বনেশে জ্বর রোগেই তো সে তাহার স্নেহময় পিতাকে অকালে হারাইয়াছে, আবার মা'ও যদি সেই রকম—না না, ও সব অমঙ্গলের কথা ভাবিয়া সুধীর মিছে মন খারাপ করিতেছে কেন? জ্বর কাহার না হয়? এইতো সেদিন মামাবাবুর জ্বর হইয়াছিল, তাও কি কম? একেবারে একশো চার, পাঁচ ডিগ্রি,—সারিয়া গেল তো? আর পুষিটা কি জ্বরে জ্বরে কম ভুগিয়াছে? ছোটবেলায় তাহার নিত্য জ্বরের জ্বালায় ডাক্তারকেও হার মানিতে হইয়াছিল। তবে সুধীরের মা'ই বা সারিয়া উঠিবেন না কেন? অকূল ভাবনায় পড়িয়া সুধীর মায়ের জ্বরতপ্ত কপালের উপর হাত রাখিয়া ব্যগ্রভাবে কহিল "মাথাটা ধরেছে নাকি মা? একটু টিপে দেব?"

মাতৃভক্ত অনুগত পুত্রের এই সেবা করিবার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া মাতা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, মমতাস্নিগ্ধ সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, "আচ্ছা, দে না হয় মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, আবার সকালে উঠেই স্কুলে ছুটতে হবে তো?—হ্যাঁরে সুধীর! আমি যদি সকাল করে উঠ্‌তে না পারি, তাহলে তোর ইস্কুলের ভাতের কি হবে বল দেখি? বউ তো আমার অসুখের কথা জানে না, সে হয় তো বেলা করেই উঠবে—"

অসুখের মধ্যেও মাতাকে তাহার আহারের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইতে

দেখিয়া সুধীরের এত দুঃখেও হাসি আসিল। মাতাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য সুধীর সহাস্যে বলিল "মাগো! তোমার এখন থেকেই আমার ভাতের ভাবনা লেগেছে? সকালতো হ'ক, তোমার শরীর যদি ভাল না থাকে তাহলে আমিতো স্কুলেই যাব না। এখন ওসব ভাবনা রেখে দিয়ে তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি মা!"

"তা হলে তুইও ঘুমো,—আর কতক্ষণ জেগে বসে থাক্‌বি বাবা?"

"আর একটু থাকি।"

সুধীর তাহার কোমল করাঙ্গুলি মাতার রুক্ষ কেশরাশির মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চালন করিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

শান্তিহারা পীড়িতা জননী প্রাণাধিক পুত্রের এই আন্তরিক সেবাটুকু মুদিত নয়নে নীরবে উপভোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই চক্ষু মেলিয়া বলিলেন "সুধীর!"

"কেন মা?"

পুত্রের পানে গভীর স্নেহভরা কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে বলিলেন—"মানুষের জীবনের কথা বলা যায় না বাবা, মনে কর যদি আমার এ জ্বর আর না সারে, যদিই—"

মাতার সেই নিষ্ঠুর বচনে আহত হইয়া সুধীর ব্যথিত কণ্ঠে বলিল "কেন মা এমন কথা বলছ? জ্বর সারবে না কেন? আমি খুব সকালে গিয়ে ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনব, তাঁর বাসা আমি জানি তো, সেবার মামার অসুখের সময় কতবার গিয়েছি—"

"ডাক্তারে কি পরমায়ু দিতে পারে পাগল? আমি যে কদিন ধরে ক্রমাগত স্বপ্ন দেখছি তাঁকে—"

"বাবাকে ?"

"হ্যাঁ, সেই যে ময়ূরকণ্ঠ চেলীখানা পরে তিনি আহ্নিক করতেন, সেই খানা পরে যেন হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়েছেন এসে, তাঁর সমস্ত গায়ে মুখে কিসের একটা জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে, তিনি হাত নেড়ে ইসারায় যেন কেবলি আমাকে ডাকছেন, তাই আমার মনে হয় সুধীর, হয়তো এদ্দিন পরে সত্যই আমার ডাক পড়েছে, আমার ভোগের শেষ হয়েছে এবার—"

মর্ম্মাহত বালক এবার আর কথা কহিতে পারিল না, তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা পীড়িতা জননীর মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল।

ব্যথিত পুত্রকে কোলে টানিয়া লইয়া অনুতপ্তা মাতা ক্ষোভের সহিত বলিলেন "এইটুকুতেই কেঁদে ভাসিয়ে দিলি বাবা;—কিন্তু বাপ মা যে কারও চিরদিন থাকে না রে পাগল! তার জন্যে কান্নাকাটি করলে চলবে কেন ?"

কিন্তু সুধীর প্রবোধ মানিল না, মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া আর্ত্ত বালক ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া অন্নপূর্ণা সস্নেহ সান্ত্বনায় কহিলেন "কাঁদিসনে বাবা, কাঁদিসনে আর, চুপ কর, তোর চোখে জল দেখলে যে আমার বুক ফেটে যায় ধন!"

রোরুদ্যমান সুধীর মুখ না তুলিয়াই অভিমান সংক্ষুব্ধ বাষ্পজড়িত স্বরে বলিল "তবে কেন একথা বল্লে তুমি? বল, আর কক্ষনো বলবে না?" "না রে বাবা আর বলব না, তুই স্থির হ। জ্বরের ঝোঁকে কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কি করি বল্? কেমন যে দুর্ব্বুদ্ধি আমার,

বাছাকে মাঝ রাতে খামখা কাঁদিয়ে দিলুম। ওঠ বাবা, এইবার শুয়ে পড় একটু, রাত আর বেশী নেই।" ছেলের চোখের জল স্নেহ ভরে মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে কোলের কাছে শোয়াইয়া অন্নপূর্ণা একটু হাসিয়া বলিলেন "ভয় নেই রে সুধীর! তোর মা এত পুণ্য করেনি যে এত শীগ্‌গির ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করবে, এই দেখ, শীতটা কমে গেছে এইবার ঘাম হয়ে জ্বরটা কমবে বোধ হয়। নে, এখন তুই নিশ্চিন্দি হয়ে চোখ বোজ একটু।"

কিন্তু সুধীর চোখ বুজিবার পূর্ব্বেই তিনি আবাব বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মামাবাবুর অবাধ্য কখনো হয়ো না বাবা, আর তোমার মামী, হক্ সে একটু রাগী স্বভাব, কিন্তু তোমাকে সত্যি সত্যি ভাল-বাসে, তার ওপর রাগ অভিমান করে তুমি যেন কোনও দিন—"

সুধীর বাধা প্রদান করিয়া বলিল "আবার ঐ সব ছাই ভস্ম কথা আরম্ভ করলে মা? এই না বল্লে আর বলবে না?"

"ওঃ! ভুলে গেছি, আজ কি জানি কেন কেবলি বক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে বাবা, তাই চুপ করে থাক্‌তে পারছি না। হ্যাঁ কি বলছিলুম? বেশ ভাল ছেলে হ'ও সুধীর, আমি থাকি না থাকি, খুব মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে দশের একজন হবার চেষ্টা করো, ওঁর বড় সাধ ছিল—ঐ দেখ! আবার বক্‌তে আরম্ভ করলুম। তুই ঘুমো বাবা, ঘুমো, আমিও একটু চোখ বোজ-বার চেষ্টা করি।" মায়ের আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শ্রান্ত বালক শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু জ্বরের যন্ত্রণায় অন্নপূর্ণা এক মুহূর্ত্তও ঘুমাইতে পারিলেন না, সুষুপ্ত পুত্রের সরল কচি মুখখানির পানে চাহিয়া তিনি সজল চক্ষে, স্নেহ ব্যাকুল মনে বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন

"ভগবান! দয়াময় অনাথের নাথ! অসহায়ের সহায়! দুঃখিনীর ধনকে চরণে রেখো প্রভু! সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, তুমি ওর সহায় হ'ও, নইলে বাছার মুখের পানে চাইবার আর যে কেউ রইল না নাথ!"

অন্নপূর্ণা মিথ্যা বলেন নাই, তাঁহার মুক্তির আহ্বান এবার সত্য সত্যই আসিয়াছিল। পরদিন ডাক্তার আসিয়া পীড়িতার অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ করিলেন জ্বরটা সাধারণ নহে, সম্ভবতঃ প্লেগ। গাজি-পুরে সেই প্রথম প্লেগ আরম্ভ হইয়াছে। মাত্র দুটী দিন রোগের প্রবল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একমাত্র স্নেহের নিধিটীকে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্নপূর্ণা শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পিতৃ মাতৃহীন মূর্চ্ছাতুর সুধীরকে বক্ষে চাপিয়া নীরদা সহোদরা-কল্পা ননন্দার শোকে প্রকৃতই অধীরা হইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো ঠাকুরঝি গো! তোমার মনে কি শেষে এই ছিল গো? এতদিন এত ভালবেসে, এত যত্ন দেখিয়ে, শেষে কিনা এতবড় শত্রুতা সেধে গেলে? তোমার দুঃখের ধন, বুকের মাণিককে আমি কি করে বোঝাব, বাছাকে কি করে বাঁচিয়ে রাখব গো? আমি যে কিছুই জানি না।"

তিন

দয়াময় জগৎপিতার অপরূপ বিধানে শোক জিনিসটা মর্ম্মঘাতী হইলেও চিরস্থায়ী হয় না। হইলে এই দুঃখ তাপ পূর্ণ অনিত্য সংসারে নিত্য শোকগ্রস্ত প্রাণীগুলির ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনটুকুও অসহ্য দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মত স্নেহময়ী জননীর বিয়োগ বেদনা সুধীরের কোমল প্রাণে প্রথমটা বড় নিষ্ঠুর প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করিলেও কালের বিচিত্র মহিমায় ক্রমশঃ তাহা সহনীয় হইয়া আসিল।

মাতুলের অকৃত্রিম স্নেহ, এবং মাসীমার প্রভূত যত্নে সুধীর শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইল, এবং পিতামাতার অপূর্ণ মনোসাধ পূর্ণ করিবার জন্য অখণ্ড মনযোগের সহিত লেখাপড়ায় লাগিয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র অবসর কালটুকু মামাত বোন পুষ্পরাণীর অধিকারভুক্ত ছিল। বালিকা সুধীরের এতই অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার খেলা ধূলা, আদর আবদার কিছুই দাদা নহিলে চলিত না, দাদার চক্ষে একবিন্দু জল দেখিলে পুষ্পরাণী কাঁদিয়া আকুল হইত। তাই কোমল অন্তরখানি মাতার বিয়োগ শোকে অহরহ কাঁদিতে থাকিলেও সুধীর প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলিবার অবকাশ পাইত না।

একটী বৎসর ঘুরিয়া গেল। সুধীর এইবার ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষা দিয়াছে।

বৈশাখের খররৌদ্র দীপ্ত স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। প্রভাতের সেই স্পর্শ সুখকর

মেয়ের বাপ

স্নিগ্ধ বাতাসটুকু অসম্ভব তাতিয়া উঠিয়াছে। প্রবল প্রতাপ গ্রীষ্মরাজের বন্দনা করিতে প্রকৃতিরাণীর মোহন বীণায় নিদাঘ বেলায় চিত্ত উদাস করা অলস রাগিণী বাজিয়া উঠিতেছিল।

নীরদা ঘরের দরজা জানালা ভেজাইয়া দিয়া, তাহার কোলের মেয়েটীকে ঘুম পাড়াইতেছিল। সেই স্বল্পালোকিত কক্ষের একটী পার্শ্বে একখানি ছোট সতরঞ্চি পাতিয়া পুষ্পরাণী পুতুলের বাক্স লইয়া খেলায় নিমগ্ন। তাহার সব পুতুলের সেরা পুতুল বনশোভিনীর মেয়ে বকুল মালার সহিত বনশোভিনীর বড় বোন শতদলবাসিনীর দেবর চম্পক কুমারের বিবাহ হইলে দুই ভগিনীর মধ্যে সম্পর্কটা কিরূপ দাঁড়াইবে, পুষ্প তখন গম্ভীর মুখে তাহারই মীমাংসা করিতেছিল।

নিদ্রিতা খুকীকে সাবধানে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া তাহার ঘর্ম্মাক্ত দেহে পাখার বাতাস দিতে দিতে নীরদা পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে পুষি! সুধীর এখনো এল না যে, গিয়েছে তো অনেকক্ষণ?"

পুষ্প মাথা নাড়িয়া বলিল, "এলে আর আমাকে ডাকৃত না? হ্যাঁ মা! দাদা আজ আবার স্কুলে গেল কেন? তবে যে বলে ইস্কুলের পড়া হ'য়ে গেছে?"

নীরদা হাসিয়া বলিলেন, "দাদার ইস্কুলের পড়া তো সত্যি শেষ হ'য়ে গেছে রে,—আজ যে তাদের রেজাল্ট বেরুবার কথা, তাই তো এত সাত তাড়াতাড়ি গেল। কিন্তু এতক্ষণ ফিরে আসা উচিত ছিল, এল না কেন কি জানি। একটু দোর গোড়ায় গিয়ে দেখবি মা?"

আর বলিতে হইল না, "ওমা সত্যি? তাহলে আমি যাই দেখিগে,

দাদা যে পাশ হলে আমাকে পুতুলের জন্য পুঁতির মালা কিনে দেবে বলেছে—দাদা নিশ্চয় পাশ হবে, না মা?" বলিতে বলিতে উল্লসিতা বালিকা ঘুমুর গাঁথা মালা বাজাইয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল। কিন্তু চঞ্চল চরণের গতি শ্লথ করিয়া পুষ্পরাণী খানিক পরে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল।

তাহার শুষ্ক বিমর্ষ মুখখানির পানে চাহিয়া নীরদা সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল রে? সুধীর আসে নি নাকি?"

হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে পুষ্প কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "দাদা কখন চুপি চুপি এসে ওঘরে শুয়ে পড়ে কাঁদছে, কি জানি তার কি হয়েছে।"

"কাঁদছে? সেকি রে?" নীরদা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "চল তো দেখিগে কি হ'ল তার। হয়তো পাশ হ'তে পারেনি তাই দুঃখ হয়েছে। যে অভিমানী ছেলে, কি আবার ক'রে বসে।"

সুধীর পাশের ঘরে শয্যাহীন খাটের উপর উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। নীরদা কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে সুধীর, অমন করে এসে শুয়ে পড়লি যে?"

সুধীর তথাপি মুখ তুলিল না, চাপা কান্নার রুদ্ধ আবেগে তাহার দেহখানা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তাহার এই আকুল ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া নীরদা সুধীরকে তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এবার হল না আবার আস্‌ছে বছর পাশ দেবে তার জন্যে এত দুঃখ কেন বাবা?"

সুধীর উঠিয়া বসিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "না মামীমা আমি পাশ হ'য়েছি।"

"পাশ হয়েছিস্, তবে কেন—"

সুধীর তাড়াতাড়ি মামীমার পায়ের ধূলো লইয়া বলিল, "হ্যাঁ মামীমা, ফাষ্ট ডিভিশনে—"

নীরদা সুধীরের চিবুক স্পর্শ করিয়া পুলকিত স্বরে বলিল, "তবে কাঁদছিলি কেন রে বোকা ছেলে?"

এ কেনর উত্তর সুধীর দিতে পারিল না। আজ পাশের খবর্ পাইয়া পর্য্যন্ত বালকের ব্যাকুল মনখানি তাহার পরলোকগতা মাতার স্মৃতিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সুধীরের সেই স্নেহময়ী মা আজ কোথায়? আজি এই আনন্দের দিনে, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের সাফল্য-সংবাদে তিনি কতই না সুখী হইতেন, তাহাকে বক্ষে লইয়া মাতা কত আশীর্ব্বাদ করিতেন, মনে মনে কল্পনা করিয়া সুধীর আজ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

বালকের মর্ম্মব্যথা অনুমানে বুঝিয়া লইয়া নীরদা মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে পুষি! তোর দাদা পাশ হয়েছে যে, তোর কথাই ঠিক হ'ল।"

পুষ্প ম্রিয়মান্ হইয়া দরজার পাশে লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মায়ের আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়া সুধীরের কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। দাদা তখনও কথা কহিল না দেখিয়া সে সুধীরের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ছল ছল চক্ষে বলিল, "আমার আর পুঁতির মালা চাই না দাদা—"

অবোধ বালিকার এই ক্ষুদ্র সান্ত্বনাটুকু সুধীরের ব্যথাবিধুর

তপ্ত হৃদয়ে যেন অমৃত সিঞ্চন করিল। মেঘ ভাঙ্গা রৌদ্রের মত তাহার অশ্রুসজল মুখে স্নেহের হাসি ফুটিয়া উঠিল। আদরের বোন্‌টীকে কোলে টানিয়া সুধীর স্নেহভরে কহিল "চাই বই কি রাণী! আমি আজই ওবেলা বাজারে গিয়ে কত ভাল ভাল রঙ্গীন পুঁতির মালা কিনে আন্‌ব দেখিস।"

পুষ্প পুলকিত হইয়া পরমোৎসাহে হাত মুখ নাড়িয়া বলিল "আচ্ছা এনে দিও, আর দেখ দাদা, আমার বকুল মালার বিয়ের চেলী নেইতো, যদি এক টুকরো লাল রংয়ের কাপড় এনে দাও, তা'হলে আমার কাছে জরীর পাড় আছে তাই বসিয়ে নেই, দেবে তো?"

"বেশ তাও এনে দেব।"

ভাই বোন দুটীর পানে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া নীরদা হাসিমুখে বলিল "দাদাকে ফরমাস তো খুব করা হচ্ছে, কিন্তু ওকে খেতে টেতে দিবি না বুঝি? সেই কখন দুটী ভাত মুখে দিয়ে গিয়েছে, তারপর আর জলটুকু খায়নি। তুমি ওঠ সুধীর, হাতে মুখে জল দিয়ে এস, আমি খাবার আনছি এখনি।"

নীরদা যাইতে যাইতে মনে মনে বলিল "আহা! ঠাকুরঝির কি কপাল! এমন সোণার চাঁদ নিয়ে দুটো দিন ভোগ করতেও পেলেন না!"

চার।

রাত্রে নীরদা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁগা, সুধীরের ইস্কুলের পড়া তো হয়ে গেল, এখন সে কি করবে?"

অবিনাশ বাবু শিয়রের দিকে আলো রাখিয়া একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। স্ত্রীর প্রশ্নে কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "সুধীর কি বলে? তার কি ইচ্ছে জানো?"

"জানি, তার ইচ্ছে কলেজে পড়ে।"

"আমারও তাই ইচ্ছে, কিন্তু এখানে তো কলেজ নেই, বেনারসে রেখে পড়াতে হবে।"

নীরদা চিন্তিত মুখে কহিল "কিন্তু বেনারসে আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব কেউ নেই তো, মেসে রেখে পড়ান, সে যে বিস্তর খরচ, অত খরচ তুমি যোগাবে কোত্থেকে?"

"সেটা ভাববার বিষয় বটে, তবে আপাততঃ সুবোধের যে টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা আছে, তাই দিয়ে এফ্‌ এ পড়ার খরচটা চলে যেতে পারে।"

নীরদা একটু ভাবিয়া বলিল "কিন্তু ঐ টাকা ক'টী তো বেচারার সম্বল, আমাদের যা অবস্থা তাতে—"

"টাকা নাই বা থাকল নীরো, সুধীর যে রকম বুদ্ধিমান ছেলে, যদি ভাল লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে, তা'হলে অমন কত টাকা সে উপার্জ্জন করবে দেখো। পুরুষের পেটে বিদ্যে থাকা চাই।"

"ঠিক কথা, ঠাকুরঝিও এই কথাই বল্‌ত গো, বল্‌ত তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ কর বউ, সুধীর আমার যেন বিদ্বান্‌ হতে পারে, যার বিদ্যে আছে তার সবই আছে।"

"অনু বড় বুদ্ধিমতী ছিল।" অবিনাশ বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃতা ভগিনীর উদ্দেশ্যে বলিলেন "সে যে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে, তা'কি কোন দিন মনে ভেবেছিলুম!"

সুধীরের প্রবাস যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। পুষ্প তখন কাঁদিয়া বলিল সেও দাদার সহিত যাইবে। তাহার এই অসঙ্গত আবদারের জন্য মায়ের কাছে তাড়া খাইয়া পুষ্পরাণী সুধীরকে গ্রেপ্তার করিল। সুধীর তখন তাহার ট্রাঙ্কে বই ও খাতাপত্র তুলিতেছিল, তাহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পুষ্প কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল "আমি তোমার সঙ্গে যাব দাদা! আমাকেও নিয়ে চল সেখানে।"

সরলা বালিকার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া সুধীরের চক্ষে জল আসিল। এই স্নেহের প্রতিমা বোনটীর জন্যই সুধীরের বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বেশী কষ্ট বোধ হইতেছিল। গোপনে চক্ষু মুছিয়া সুধীর পুষ্পকে মিষ্টকথায় সান্ত্বনা দিয়া বলিল "সেখানে কার কাছে থাক্‌বিরে পাগলি? আমাকে যে মেসে থাক্‌তে হবে।"

"কেন মেয়েরা কি মেসে থাকে না? সেখানে কি সবই ব্যাটাছেলে?"

সুধীর উত্তর করিবার পূর্ব্বেই নীরদা আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "আবার এখানে এসে সুধীরকে ধরা হয়েছে; মাগো মা! এ পাগল মেয়েটাকে নিয়ে আমি যে বড় মুস্কিলে পড়লুম সুধীর! বোঝালে বোঝে না, কিছু না ওকে এত আস্কারা কেন দিয়েছিলি বল্‌ত?"

মেয়ের বাপ।

সুধীর ম্লানমুখে স্নেহের হাসি হাসিয়া বলিল "না মামীমা, রাণী আমাদের বড় লক্ষ্মী মেয়ে, সে তোমার কাছে কেমন শান্তটী হয়ে থাক্‌বে, কেমন মন দিয়ে লেখাপড়া করবে, তা দেখো। এই দ্বিতীয় ভাগ খানা শেষ কর্‌লেই একটা বেশ ভাল প্রাইজ পাবি, জান্‌লি রাণী!"

রাণী অভিমান ভরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল "কচু পাব! তুমি এখানে থাক্‌বে কিনা প্রাইজ দিতে?"

নীরদা বলিল "ওমা ওকি কথা; সুধীর মগের মুল্লুকে যাচ্ছে নাকিরে? কাশী থেকে গাজিপুর তো এপাড়া ওপাড়া। মনে করলেই চলে আসতে পারে। তার জন্যে তুই এত অস্থির হচ্ছিস কেন পুষি?"

পুষ্প মায়ের কথায় শান্ত হইতে পারিল না, সে বিষণ্ণমুখে কাতর ভাবে কহিল "তুমি তো ঐ কথা বলে দিলে, কিন্তু দাদা না থাক্‌লে আমি একলাটি কেমন করে থাক্‌ব বল তো? কে আমায় গল্প বলবে, কেই বা খেলাঘর গুছিয়ে দেবে? খুকীটা তো কোনও কর্ম্মেরই নয়, কেবল খেলনা ভাঙ্গ্‌বার যম!"

নীরদা মেয়েকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিল "আর বেশী দিন একলাটী থাক্‌তে হবে নারে! রোস্ না, তোর দাদাকে ভাল করে লেখাপড়া শিখ্‌তে দে, তারপর শীগ্‌গিরি একটী রাঙ্গা টুক্‌টুকে বউ এনে তোর খেলার সাথী করে দেবে।"

পুষ্পরাণীর ম্লানমুখে উল্লাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল, সুধীরের লজ্জাবনত মুখের পানে চাহিয়া সে সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল "সত্যি দাদা?"

দাদা কিন্তু নিরুত্তর।

নীরদা হাসিতে হাসিতে বলিল "সত্যি না তো কি, আমি মিথ্যে বলছি।"

পুষ্পরাণী হর্ষোজ্জ্বল চক্ষুদুটীতে মায়ের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দাদার বউ কত বড় হবে মা? আমার সঙ্গে ঝগড়া করবে না তো?"

"না, ঝগড়া করবে কেন? তোর দাদার বউ কেমন সুন্দর হবে দেখিস তখন।"

পুষ্প আর দ্বিরুক্তি করিল না। সেই কল্পিত পরীর মত ফুট্‌ফুটে সুন্দরী নববধূটীর শুভ আগমন সম্ভাবনায় উৎফুল্ল ও আশ্বস্ত হইয়া সে তখন নিজের হাতেই দাদার পুঁথিপত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল। যথাসময় অবিনাশ বাবু সুধীরকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন এবং তাহাকে বেনারস কুইন্স কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পুষ্পরাণী পিতাকে বার বার দাদার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নীরদা উদাস হইয়া বলিল "মাগো! ছেলেটা গিয়ে যেন বাড়ী টেঁকা দায় হয়েছে! ভাগ্নের পরে যে এতখানি মায়া বসতে পারে তা তো এদ্দিন জানতুম না! হ্যাঁগা! সুধীরকে সেখানে রেখে তুমি যখন ফিরলে তখন সুধীর কাঁদে নি তো?"

স্ত্রীর কথায় অবিনাশ বাবু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন "কাঁদবে কেন? ব্যাটা ছেলে অত নরম হলে কি চলে? আর সুধীর তো তেমন অবুঝ ছেলে নয়, সেখানে থেকে সে খুব শীগ্‌গির উন্নতি করতে পারবে দেখো।"

নীরদা সনিশ্বাসে কহিল "আহা! তাই হ'ক্, সেদিন পাশের খবর নিয়ে এসে বাছা আমার যে কান্নাটা কেঁদেছিল, মনে হলেও যেন

বুক ফেটে যায়। যার মা নেই, তার যে কেউ নেই গো!" বলিতে বলিতে অশ্রুসজল চক্ষে নীরদা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

অবিনাশ বাবু নির্ব্বাক বিস্ময়ে গমনপরা পত্নীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন এই খিট্‌খিটে রুক্ষপ্রকৃতি মানুষটীর মধ্যে এতখানি স্নেহ ও করুণার সমাবেশ, এ যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

পাঁচ।

দুই বৎসর পরের কথা। ইহার মধ্যে সুধীর অনেকবার বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছে। প্রত্যেকবারেই তাহার আদরের রাণীর জন্য নূতন নূতন উপহার সামগ্রী লইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুষ্পরাণী তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। দাদার রাঙ্গা বউ আসার আশায় সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সেদিন শেষ পরীক্ষা দিয়া সুধীর কলেজ হইতে বাসার দিকে ফিরিতেছিল, মাঝপথে তাহার সহপাঠী বিনয় আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। বিনয় সুধীরের চেয়ে বছর দুই বড়। সে সুধীরের হাত ধরিয়া সানুরোধে বলিল "এরি মধ্যে বাসায় গিয়ে কি হবে সুধীর? তার চেয়ে চল না কেন গঙ্গার দিকে একটু বেড়িয়ে এসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নেওয়া যাক্, কদিন সমানে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করে করে শরীরের দফা রফা হয়ে গেছে, আজ কি রকম হাল্‌কা মনে হচ্ছে! ভাব ছিস কি, বল্‌ না?"

কিন্তু আজিকার দিনটা ভ্রমণের পক্ষে অনুকূল ছিল না। বেলা দুপুর হইতে ধূলি উঠিয়া আকাশের বর্ণকে ঘোলাটে এবং নিদাঘের তীব্র অসহ্য রৌদ্রকরদীপ্তিকে ম্লান করিয়া তুলিয়াছিল।

গ্রীষ্মকালে প্রকৃতির এইরূপ অবস্থা পশ্চিম অঞ্চলে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ইহা দুর্য্যোগের পূর্ব্ব সূচনা।

তাই বন্ধুর প্রস্তাবে সুধীর অসম্মত হইয়া বলিল "না ভাই, দেখছ না আকাশের গতিক কি রকম, সোজা বাসায় যাওয়াই ভাল।"

মেয়ের বাপ।

"আহা ওরকম ধূলো ওঠা তো আজ নূতন নয়, না হয় একটা আঁধিই আসবে, তার বেশী আর কি—"

"নারে শুধু আঁধিই নয়, দেখ দেখি একবার ওদিকে চেয়ে।" উত্তরে দেখিল একখানা প্রকাণ্ড কালো মেঘ, বিপুলকায় ঐরাবতের মত ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। দুর্য্যোগ আসন্ন।

কিন্তু বিনয় হটিবার পাত্র নহে। আজ পরীক্ষার বিষম বিভীষিকা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাহার নিঃশঙ্ক তরুণ চিত্ত মুক্তির আনন্দে ভরপূর হইয়া গিয়াছিল। সে স্ফূর্ত্তির সহিত পরমোৎসাহে কহিল "বাঃ! এইতো বেড়াবার সময়! ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেশ তো একটা কিছু এড্‌ভেঞ্চার—

"দূর তোর এড্‌ভেঞ্চার! এই কাল-বৈশাখীর পড়ন্ত বেলায় জেনে শুনে কে বেরোয় বল্ দেখি? যেতে হয় তুই একা যা না, আমাকে টানিস্ কেন?"

সুধীর বন্ধুর মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া স্বীয় গন্তব্য পথে চলিল; কিন্তু দুই পা অগ্রসর না হইতেই বিনয় পুনরায় আসিয়া পাকড়াও করিল। বলিল "আচ্ছা বেশী না হয় একটুখানি ঘুরে আসি চল্, একা একা বেড়াতে ভাল লাগে না, তাইতো এত সাধাসাধি করছি তোকে, নইলে আমি পথ কি চিনি না? কাল তো বাড়ী চলে যাবি, ফের কদ্দিনে দেখা হবে তার ঠিক নেই, চল্ না ভাই!"

বন্ধুর নির্ব্বন্ধ এড়াইতে না পারিয়া সুধীর তাহার সঙ্গে চলিতে চলিতে বলিল "সত্যিই কোনও ঠিক নেই, আমার কলেজে পড়ার বোধ হয় এই শেষ হয়ে গেল। তাই কলেজকে আজ নমস্কার করে এলুম।"

বন্ধুর হতাশ কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া বিনয় তাহার মুখ পানে চাহিয়া সাগ্রহে বলিল "কেন রে? তোর পেপার তো খুব ভাল করেছিস বল্লি, তবে আবার এ কথা বল্‌ছিস্ কেন?"

"বল্‌চি কি আর সাধে ভাই? আমার বাড়ীর যা অবস্থা তাতো জানিস্ না, মামা বেচারি ছা-পোষা মানুষ, নিজের সংসার নিয়েই বিব্রত, তার ওপর আবার কলেজে পড়ার খরচ বারমাস যোগাবেন কোথেকে?"

বিনয় দুঃখিত অন্তরে বলিল "তা হলে আর তুই পড়বি না সুধীর? কি করবি—চাকরী-বাকরী?"

"কাজেই, বাধ্য হয়ে তাই করতে হবে। তবে একটা উপায় আছে, যদি কোথাও টিউসনি পেয়ে যাই, কিন্তু তাই বা জুটিয়ে দেবে কে?"

"আচ্ছা আমি দেখব চেষ্টা করে, এখানে আমার তো অনেকের সঙ্গে জানা শুনা আছে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার মধ্যে দুই বন্ধু অন্যমনস্ক হইয়া অনেক দূর গিয়াছে, এমন সময় পশ্চিম দিগন্ত অন্ধকার করিয়া একটা সংক্ষুব্ধ ঝটিকা মূর্ত্তিমান প্রলয়ের মত হু হু করিয়া নামিয়া আসিল এবং সেই প্রবল ঝটিকাবেগে বিপরীত দিকের সেই ক্রমশঃ ঘনায়মান বিদ্যুৎগর্ভ মেঘখানা দ্রুত বিস্তৃত হইয়া দেখিতে দেখিতে আকাশময় ছাইয়া গেল।

পথটা সহরের বাহিরে, তাই লোক চলাচল অধিক ছিল না। দুই একজন পথিক, পথের উপরকার সবেগে ধাবমান রাশীকৃত

মেয়ের বাপ।

ধূলাবালির বিরুদ্ধে যুঝিতে যুঝিতে মুদিত-প্রায় চক্ষে আশ্রয় সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছিল। সুধীর আর অগ্রসর না হইয়া বলিল "এইবার মজালে বিনয়! তোর এড্‌ভেঞ্চার করার সাধ আজ ভাল করেই মিট্‌বে দেখচি।"

বিনয়ও এবার কিছু চিন্তিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা আর এগিয়ে কাজ নেই, এইবার ফেরা যাক্‌।"

"ফির্‌তে পার্‌লে তো? আমরা যে অনেক দূর চলে এসেছি, বৃষ্টি এল বলে, ছাতাও আনা হয়নি সঙ্গে। আজ সত্ত সত্ত ধূলো খেয়ে জলে ভিজে মরতে হবে দেখছি, শুধু তোর বুদ্ধিতে—"

সুধীরের মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঝড়ের বেগের সহিত সবলে যুদ্ধ করিতে করিতে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলি এখানে সেখানে ছড়াইয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে তীরের মত বিঁধিতে আরম্ভ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ঝড় বৃষ্টির সোঁ সোঁ শব্দের মধ্যে বিনয় চীৎকার করিয়া বলিল "ওই দিকে ছুটে চল সুধীর! ওই যে পথের ওধারে একটা হল্‌দে রংয়ের বাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

তাহারা দুইজনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে অবিলম্বে একটা সুদৃশ্য প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং রাস্তার দিকের জোড়া থামওয়ালা উঁচু বারান্দার উপর লাফাইয়া উঠিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইয়া মুষলধারে বারিপাত হইতেছিল।

বারান্দার সঙ্গে একখানা প্রশস্ত 'হলঘর', উহা সম্ভবতঃ বৈঠকখানা, ঘরের রঙ্গীন কাঁচ বসান বিচিত্র দরজা জানালাগুলি বোধ হয়

ঝড় বৃষ্টির ভয়ে বন্ধ রাখা হইয়াছে। প্রবেশ দ্বারের উপরে শুভ্র প্রস্তর ফলকে লেখা 'আনন্দ ধাম'।

সুধীর মাথার জল কোঁচার খুঁটে মুছিতে মুছিতে চমৎকৃত হইয়া বলিল "এ যে দেখছি কোন বড় লোকের বাড়ী রে! শেষকালে গলাধাক্কা খেতে হবে না তো?"

"না, না, সে ভয় নেই, এবাড়ী যাঁর তাঁকে যে আমি চিনি।"

সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য মুগ্ধনয়নে দেখিতে দেখিতে, সুধীর সবিস্ময়ে বলিল "সত্যি নাকি? কে তিনি ভাই? আহা বাড়ী তো নয় যেন ইন্দ্র ভবন।"

বিনয় সহাস্যে কহিল "এই ইন্দ্রভবনের মালিক হতে চাস্ সুধীর? বল্‌তো চেষ্টা করে দেখি।"

"কি যে মাথা মুণ্ডু বকিস্ তা'র ঠিক নেই? বাড়ীখানা কি বেওয়ারিশ নাকি যে, যে ইচ্ছে মালিক হতে পারে?"

বিনয় মুচকি হাসিয়া বলিল "বাড়ী বেওয়ারিশ নয়, তবে বাড়ীর মধ্যে বেওয়ারিশ মাল আছে বটে, তাকে যদি—"

সুধীর বিরক্তিভরে বাধা দিয়া বলিল "আঃ! হেঁয়ালি রেখে কথাটা সোজা করেই বল্ না ছাই! সব সময় তোর ফাজ্‌লামো ভাল লাগে না বিনয়!"

"তবে সোজা করেই বলি, যোগেশ্বর উকীলকে জানিস না? মস্ত বড় নামজাদা লোক, এই বাড়ীখানা ছাড়া সহরে তাঁর আরও অনেকগুলো বাড়ী আর জমাজমীও যথেষ্ট আছে। লোকটা শুধু ধনী নয়, এদিকে দয়াধর্ম্ম, দান, ধ্যানও করেন খুব।"

মেয়ের বাপ।

"ওহো! যোগেশ্বর উকীলের নাম ডাক যেন শুনেছি মনে হয়, তবে চক্ষে দেখবার সৌভাগ্য কখনো হয় নি। কিন্তু তোর সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হ'ল কেমন করে?"

"আলাপ পরিচয় ঠিক নয়, তবে উকীলবাবু আমাকে দেখলেই চিন্‌তে পারবেন বোধ হয়। কেন না, আমি এই মাস কতক আগে আমাদের পুওর ফণ্ডের জন্য চাঁদা নিতে এসেছিলুম, তার আগেও কতবার কত সভাসমিতিতে ওঁকে দেখেছি। লোকটা বড় দয়ালু, আর—"

বিনয় মুখভঙ্গী সহকারে চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "ওঁর যে একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে কিনা? সেই মেয়েটিই ওঁর সর্ব্বস্ব, তা'র জন্য একটী ভালগোছ ঘরজামাইয়ের দরকার, তাই ভদ্রলোক বেচারীকে কলেজের ছাত্রদেরও খোঁজ রাখতে হয়। তোর এখনো সন্ধান পান নি বোধ হয়, নইলে এদ্দিন কি পড়ে থাকতিস্?"

এতক্ষণে ভিতরের ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই নাকি? তা'হলে তুইও তো ভাল ছেলে, তুই বা এদ্দিন পড়ে রইলি কেন? তোকে পছন্দ হল না বুঝি?"

বিনয় রহস্যচ্ছলে ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "সে কপাল করিনি তো! লেখাপড়ায় ভাল হলে কি হয়, ভগবান আমার চেহারাটা মোটেই কার্ত্তিকের মত করেন নি! বুড়ো রূপ গুণ বিদ্যে' সমস্তই যে একাধারে খোঁজে। তা'র কারণ মেয়েটীও নাকি ভারি সুন্দরী।"

সহসা খট্ করিয়া একটা শব্দ হওয়ায় বন্ধুদ্বয়ের কথাবার্ত্তায় বাধা পড়িল। তাহাদের সচকিত দৃষ্টি যুগপৎ সন্তমুক্ত বাতায়নের দিকে ছুটিল। বারান্দার শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল, অর্দ্ধোন্মুক্ত জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া একটী রূপময়ী কিশোরী। তাহার লাবণ্যময় অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ঘরের ঝাপ্‌সা অন্ধকারের মধ্যে যেন আধ ফোটা বাসন্তী গোলাপ ফুলের মতই ফুটিয়া রহিয়াছে। কানের উজ্জ্বল হীরার দুলদুটি নাড়া পাইয়া ঝিক্ মিক্ করিয়া দুলিতেছে।

বহিঃপ্রকৃতির সে প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখিবামাত্র মেয়েটী চিন্তিত মুখে উদ্বিগ্ন স্বরে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল "মাগো! বৃষ্টি যে আরো চেপে এল! বাবা এখনও এলেন না!" বাহিরে দণ্ডায়মান যুবক দুইটীর পানে অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়িতেই কিশোরী লজ্জিত ও চকিত হইয়া জানালার কপাট সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

অপ্রভিত সুধীর নির্ণিমেষ নেত্র বন্ধুটিকে ঠেলিয়া দিয়া চাপা ভৎর্সনার সহিত বলিল "কি অসভ্যর মত হাঁ করে চেয়ে আছিস্ বিনয়? মেয়েটি কি মনে কর্‌বে বল দেখি?"

বিনয় থতমত খাইয়া বলিল "আহা উনি যেন দেখেন নি—একা আমাকেই দোষ দেওয়া হচ্ছে!" তারপর কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া সুধীরের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া সে বলিল "দেখ্‌লি তো? এই সেই বেওয়ারিশ মাল! বল্‌তো কপাল ঠুকে ঘট্‌কালীতে লেগে যাই।"

মেয়ের বাপ।

সুধীর গম্ভীর মুখে বলিল "তোর মাথার ঠিক নেই বিনয়, যার এত ধন সম্পত্তি আর অমন পরমাসুন্দরী মেয়ে, তার আবার ঘর জামাইয়ের অভাব,—কত ভাল ছেলে যেচে সেধে আসবে।"

সেই সময় সজোরে তীব্র আর্ত্তনাদে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে একখানা মূল্যবান মোটরকার সেই অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বাণবিদ্ধ ক্রুদ্ধ দানবের মত বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে সেইখানে ছুটিয়া আসিল। সোফার মোটর ব্রেক করিতেই একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় বয়স্ক পুরুষ ক্ষিপ্রপদে নামিয়া পড়িলেন। বিনয় সুধীরের হাত টিপিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল "ইনিই উকীলবাবু।" সুধীর এই প্রভূত ধন সম্পদের অধিকারী গৃহস্বামীর দিকে একটু আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া রহিল। কারণ ভদ্রলোকটীর আকৃতি প্রকৃতি সাধারণ বড়লোকদিগের মত রূঢ় ও অপ্রিয় দর্শন নহে।

প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইলেও তাঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ, দীর্ঘ ও উন্নত; বর্ণ সুগৌর, মুখকান্তি প্রসন্ন উদারতা ব্যঞ্জক, প্রতিভা দীপ্ত সমুজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়, এবং লক্ষ্মী সরস্বতীর লীলা নিকেতন স্বরূপ প্রশস্ত প্রশান্ত ললাট পট, দেখিলে দর্শকের মন স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়ে।

সোফারকে মোটর রাখিতে আদেশ দিয়া, যোগেশ্বর বাবু অবিরাম বর্ষিত বৃষ্টিধারা হইতে সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া বারান্দায়, উঠিয়া আসিলেন। গৃহবাসীদিগকে গৃহস্বামীর আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে আর একবার সশব্দে হর্ণ দিয়া ড্রাইভার হুস হুস্ করিয়া মোটর চালাইয়া স্বস্থানে রাখিতে গেল।

বিনয় ও সুধীর সমাগত গৃহস্বামীকে হাত তুলিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন জ্ঞাপন করিল।

যোগেশ্বর বাবু বালকের মত লঘু ক্ষিপ্রগতিতে তাহাদের সমীপস্থ হইয়া কিছু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে হে তোমরা ? আমি কি তোমাদের—" বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া তিনি বিনয়ের মুখপানে খানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, পরক্ষণেই সাগ্রহে বলিলেন "এ ছোক্‌রাটীকে কোথায় দেখেছি না ? কি নাম হে তোমার ?"

বিনয় বিনীত ভাবে কহিল "আজ্ঞে, আমার নাম বিনয়, আপনার কাছে আমি আগেও এসেছি চাঁদা নিতে !"

"ওহে ! ব্যস্ ব্যস্ ! মনে পড়ে গেছে আমার ; আর এইটী ? এ ছেলেটীকে তো কখনও দেখিনি আমি।"

বিনয় বন্ধুর পানে অপাঙ্গে চাহিয়া উত্তর করিল "এটী আমার বন্ধু আর ক্লাস ফেলো, নাম সুধীর।"

"কিন্তু পদবী কি তা বল্লে' না তো, আজকালকার নব্য ছোকরাগুলির এই এক মহৎ দোষ, নামের সঙ্গে পদবী বলে না!" বলিতে বলিতে যোগেশ্বর বাবু আপনা আপনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বন্ধুর ত্রুটী সংশোধন করিয়া সুধীর সলাজ হাস্যে কহিল "আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীসুধীর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আর এঁর নাম শ্রীবিনয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।"

"বেশ বেশ!" আদরে সুধীরের পিঠ থাবড়াইয়া যোগেশ্বর বাবু বলিলেন "তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ বাবা, এবৃষ্টি

এখন সহজে ছাড়ছে না। তার চেয়ে ঘরে বসে বিশ্রাম কর না কেন ?"

ততক্ষণে বৈঠকখানার দ্বার ও গবাক্ষগুলি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তীব্র উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক প্রবাহে সেই সুসজ্জিত সুদৃশ্য হল ঘরখানি আলোকিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং দুইজন ভৃত্য আসিয়া প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

বিনয় ও সুধীরকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাদের একখানা স্প্রীং দেওয়া ভেলভেটের নরম গদী আঁটা সোফার উপর সযত্নে বসাইয়া গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কাপড় চোপড়গুলো বেশী ভিজেছে কি ?"

বিনয় বলিল "আজ্ঞে না, বৃষ্টি জোরে আসবার আগেই আমরা এখানে এসে পড়েছিলুম, তাই বেঁচে গেছি।"

"বেশ, তবু এতটা ভেজা তোমাদের উচিত হয়নি। ব'সো, দু কাপ্ গরম চা দিতে বলি তা'হলে—"

"না না, কেন আপনি কষ্ট করছেন ?"

বন্ধুদ্বয়ের নিষেধ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া যোগেশ্বর বাবু একজন ভৃত্যকে চা আনিবার জন্য অন্দরে পাঠাইয়া দিলেন। সেই ধনী গৃহের মূল্যবান অপূর্ব্ব সজ্জা এবং ঐশ্বর্য্যের প্রচুর আড়ম্বর দেখিয়া সুধীর বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া যোগেশ্বর বলিলেন "তোমরা এফ্, এ ক্লাসের ছাত্র বুঝি ?"

বিনয় বক্তা হইয়া উত্তর দিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ আমাদের সেকেণ্ড ইয়ার এক্জামিনেশন শেষ হয়ে গেল।"

"হয়ে গেল? পেপার করলে কেমন—পাশ হবার আশা করা যায় তো?"

"মন্দ নয়, পাশ হবার আশা করা চলে।"

নির্ব্বাক সুধীরের দিকে লক্ষ্য করিয়া যোগেশ্বর বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "আর তুমি, সুধীর! তুমি কেমন—"

সুধীর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিনয় উপযাচক হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া বসিল "ওঃ! সুধীর খুব ভাল ছেলে, ও যে রকম পেপার করেছে, তাতে একটা স্কলারশিপ্ আশাও কিছু আশ্চর্য্য নয়।"

কথাটা অতিরঞ্জিত না হইলেও একজন বয়োজ্যেষ্ঠ পদস্থ ব্যক্তির সম্মুখে বন্ধুর এই প্রশংসাবলী সুধীরকে লজ্জিত ও বিব্রত করিয়া তুলিল। সে বক্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনয়ের পানে চাহিয়া মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিল। যোগেশ্বর বাবু প্রীত হইয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন "বেশ বেশ! শুনে সুখী হলুম, ছেলেদের এই রকমই তো হওয়া উচিত।"

ইহার মধ্যে একখানা সুন্দর কারুকার্য্যময় কাশ্মীরি রূপার ট্রের উপর দুই কাপ্ উষ্ণ চা, এবং দুইখানি রেকাবীতে কচুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য লইয়া ভৃত্য প্রবেশ করিল। সেগুলি টেবিলের উপর রাখাইয়া দিয়া গৃহস্বামী সুধীর ও বিনয়কে খাইতে অনুরোধ করিলেন।

একে তো সারাদিনের পরিশ্রমে এবং পদব্রজে এতদূর চলিয়া আসার ফলে শ্রান্ত বন্ধু দুটীর ক্ষুধার উদ্রেক যথেষ্টই হইয়াছিল, তাহার উপর সম্মুখে উপস্থিত উপাদেয় ও লোভনীয় খাদ্য সামগ্রীগুলি দেখিয়া তাহাদের যুগপৎ রসনা লোলুপ ও জঠরানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া

উঠিল। তাই মুখে "না না, এ কি করেছেন? এত খাবার খাবে কে?" প্রভৃতি বিনয় বাক্য উচ্চারিত করিলেও তাহারা দুইজনে অবিলম্বে সুবোধ বালকের মত আহারে মনোনিবেশ করিল।

বিনয় বুভুক্ষুর মত অবাধে খাবার গিলিতেছে দেখিয়া কুণ্ঠিত সুধীর এক একবার গোপনে তিরস্কারের দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিতেছিল। কিন্তু বিনয় হটিবার পাত্র নহে। সে প্রকৃত বুদ্ধিমানের মত দ্বিধাহীন অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রসন্নমনে সম্মুখাগত ভোজ্য পদার্থগুলি মিনিট কতকের মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর সুধীরকে তাড়া দিয়া বলিল "শীগ্‌গির করে খেয়ে নে না সুধীর! বৃষ্টিটা এইবার ধরে আসছে, সন্ধ্যেও হয়ে গেল, আবার মেসে ফিরে যেতে হবে তো!"

হাত মুখ ধুইয়া রুমালে হাত মুছিতে মুছিতে বিনয় একটা তৃপ্তির নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া একটু খানি কুণ্ঠার হাসি হাসিয়া কৃতজ্ঞ স্বরে বলিল "আজকে ক্ষিদেটা খুব হয়েছিল বটে, তা'বলে এতগুলো খাবার সমস্তই যে খেয়ে ফেলব, তা মনেও ভাবিনি!"

তাহার কথার ভঙ্গীতে আমোদিত হইয়া যোগেশ্বর বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ক্ষিদের সময় নির্ব্বিবাদে খেয়ে নেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ বাপু! তোমরা ছেলেমানুষ খাবেইতো, কিন্তু আমি যে বুড়ো হয়েছি, তবু এখনো আমার খাওয়ার বহর দেখ যদি তোমরা, তা'হলে অবাক্ হয়ে যাও। তোমরা দুজনেই মেসে থাক বুঝি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"মেসে তোমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কেমন?"

এবার বিনয় ও স্বধীর দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল। তাহাদের মনোভাব অনুমানে বুঝিয়া লইয়া যোগেশ্বর বাবুও সহাস্যে বলিলেন "মেসের খাওয়া ঐ রকমই হয়ে থাকে বাবা, আচ্ছা কাল দুপুরে তোমরা দুটীতে এখানেই এসে খাবে, কেমন ?"

বিনয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "আজ্ঞে, এইতো আজ খুব পেট ভরেই খেয়ে গেলুম, আবার কেন কষ্ট করবেন ?"

স্বধীর সসঙ্কোচে জানাইল, কাল তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে।

যোগেশ্বর বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন "কালই যেতে হবে, এই তো সবে আজ তোমাদের পরীক্ষা শেষ হ'ল, একটা দিন পেছিয়ে গেলে তোমার বাবা কি—"

বন্ধুর মনে আঘাত লাগিবার ভয়ে বিনয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "স্বধীরের বাবা নেই, মামা আছেন গাজিপুরে—"

"তাই নাকি ? তবেতো মা—"

"আজ্ঞে মা'ও নেই ওর—?"

"মা'ও নেই ? আহা ! বড়ই দুঃখের বিষয় তো !"

সেই পিতৃমাতৃহীন তরুণ যুবকের ব্যথার আভাস লাগা ম্লান স্বন্দর মুখখানির দিকে যোগেশ্বর বাবু স্নেহকরুণ নয়নে অপলকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া সেই বিপুল বিত্তের অধিকারী অপুত্রকের অতৃপ্ত ক্ষুব্ধ অন্তরখানি মমতায় উদ্বেলিত ও করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বহুদিনের পোষিত মনের আকাঙ্ক্ষার সাফল্যসম্ভাবনা তাঁহাকে অতিমাত্র আশান্বিত ও প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যোগেশ্বর বাবু স্বধীরকে সম্বোধন

করিয়া সনির্ব্বন্ধে কহিলেন "তা আমার উপরোধে একটা দিন আরও থেকে যা'ও বাবা, কাল আমার বাড়ীতে একবার আসতেই হবে, বুঝলে ?"

সুধীর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিনয় শশব্যস্তে কহিল "এর জন্যে এত অনুরোধ উপরোধ করে আপনি আমাদের লজ্জিত করছেন কেন ? কাল আমরা ঠিক সময়ে এসে হাজির হ'ব দেখ্‌বেন। একদিন পরে বাড়ী গেলে আর কি এমন ক্ষতি হবে, কি বলিস সুধীর ?"

সুধীর অগত্যা ঘাড় নাড়িয়া আজিকার আশ্রয়দাতার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিল। বৃষ্টি তখন ধরিয়াছে এবং সন্ধ্যার তরল অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। বিনয় ও সুধীর উঠিয়া যোগেশ্বর বাবুকে করযোড়ে নমস্কার করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল।

যোগেশ্বর বাবু ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন "তোমরা আমার মোটরে করেই যাও না বাবা, এই অন্ধকারে জল কাদার মধ্যে হেঁটে নাই বা গেলে।"

এবার সুধীর অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া আপত্তি জানাইয়া বলিল "না না, আমাদের অপরাধ আর বাড়াবেন না আপনি, আমরা রোজইতো হেঁটে যাই" বলিতে বলিতে সে বিনয়ের হাত ধরিয়া টপ্‌ করিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

ছয়।

জন বিরল পথের উপর দিয়া সাবধানে চলিতে চলিতে যোগেশ্বর বাবুর সস্নেহ সদয় ব্যবহার এবং বদান্যতায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত সুধীর কতকটা নিজের মনেই বলিতে লাগিল "চমৎকার মানুষ কিন্তু, এত যে বড়লোক, তা বলে এতটুকু অহঙ্কার বা গর্ব্ব নেই। আমরা কোথাকার কে অপরিচিত, অজানা লোক, কিন্তু কি রকম যত্ন আদর করা, যেন—"

সুধীরের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বিনয় বলিল "যেন কতকালের আত্মীয়, না সুধীর?"

"তা বই কি? এ রকম অমায়িক ভদ্রলোক সচরাচর দেখা যায় না।"

তারপর খানিকটা পথ নীরবে অতিক্রম করিয়া বিনয় এক সময় সকৌতুকে কহিল "ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়েছিলুম বটে, কিন্তু আমাদের যাত্রাটা যে আজ মাহেন্দ্রক্ষণেই করা হয়েছিল তাতে কোনও ভুল নেই, কি বলিস সুধীর?"

সুধীর তখন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, বন্ধুর কথার উত্তরে সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন বল্ দেখি? খুব পেটপুরে চব্যচোষ্য খেতে পাওয়া গেল তাই নাকি? আবার কাল্‌কের খাবার যোগাড়ও করে আসা হল, সত্যি তুই যে এতবড় পেটুক বিনয়! তাতো আমি জানতুম না! কি রকম হ্যাংলার মত গপ্ গপ্ করে খাচ্ছিলি, দেখে আমি তো লজ্জায় মাথা তুলতে পারিনি!"

"আর রেখে দে তোর লজ্জা! 'পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ' আমার

স্বভাব নয়। আর শুধুই কি খাওয়া? তা ছাড়া আজ আরো একটা মস্ত লাভ হয়ে গেল—”

বিনয়ের কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সুধীর ব্যগ্র কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল “কি লাভ হ'ল শুনি?”

বিনয় আর কিছু বলিল না, নীরবে পথ চলিতে চলিতে কেবল মুখ টিপিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

সুধীর তাহাকে একটা ঝাঁকুনী দিয়া সাগ্রহে বলিল “লাভটা কিসের বল্ না গাধা! আবার চাঁদা আদায় করবার মতলব নাকি?”

অন্ধকারে সুধীরের আগ্রহভরা মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুষ্ট বিনয় হাস্যচপল কণ্ঠে বলিল “হাঁ, ঠিক ধরেছিস্, কিন্তু এবার মস্ত চাঁদা সুধীর—আঃ! ঈশ্বর কৃপায় যদি হয়ে যায়, তা হলে একেবারে বাজিমাৎ আর কি?”

সুধীর রাগত হইয়া বিনয়কে পুনর্ব্বার একটা ধাক্কা দিয়া বলিল “হেয়ালী ছাড়া কি কথা বল্‌তেই শিখিস্‌নি তুই? কি যে তোর রকম তা যে বুঝতেই পারি না—”

বিনয় মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল “আহা গো ন্যাকা আর কি! কিছু বোঝেন না! আজকের এত আদর অভ্যর্থনার মানেটা কি বল দেখি?”

“কি আবার? পৃথিবীতে ভদ্রতা বলে একটা জিনিষ আছে জানিস্‌তো?—সবাইতো তোর মত স্বার্থপর নয়!”

“রেখে দে তোর ভদ্রতা! অবশ্য উকীলবাবু লোকটা যে অতি ভদ্র তা'তে কোনও সন্দেহ নেই, তবু একটুখানি স্বার্থ না থাকলে শুধু ভদ্রতার অনুরোধে মানুষ এতটা করতে পারে না। আচ্ছা তুই সত্যি

করে বল দেখি সুধীর, তোর ওপর বুড়োর কি নজর পড়েনি একটু ?—
একটু কেন, বিলক্ষণ। তা তোর তো এতে লাভ বই লোকসান নেই,
একেবারে রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ! আর মেয়েটিকেও তো স্বচক্ষেই
দেখে নিলি। মাইরী, তোর কি জোর বরাত সুধীর! আমার হিংসে
হচ্ছে যে!" একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত অতর্কিতে পিঠে পড়িয়া বিনয়ের
মুখ বন্ধ করিয়া দিল। "উহু হু! বাবারে গেছিরে! ওরে হতভাগা
অকৃতজ্ঞ! তোর জন্যে যে আমি এত করে মরলুম, তার কি এই প্রতিফল
দিলি?" বলিয়া বিনয় মুক্তকণ্ঠে খুব হাসিতে লাগিল। রুষ্ট সুধীর বিনয়ের
দন্ত বিকশিত মুখের পানে চাহিয়া কুপিতস্বরে কহিল "তোর বেয়াদবির
এই পুরস্কার! বাস্তবিক এরকম ইতরের মত ঠাট্টা করতে তোর কি
একটু লজ্জাও করে না বিনয়? কিন্তু এই নিয়ে যদি আজ মেসে একটা
কেলেঙ্কারী করিস্ তা'হলে সত্যি বল্‌ছি আমি কাল সকালে উঠেই
গাজিপুরে চম্পট্ দেব। তারপর, তুই একা গিয়ে সেখানে আমার ভাগের
খাবারগুলোও গিলে আসিস্ ব্রহ্ম রাক্ষসের মত, আর—" একটু থামিয়া
সুধীর কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া বলিল "আর পারিস্ যদি ও রাজকন্যা আর
রাজত্ব তুই নিজেই বাগিয়ে নিস্, আমার কিচ্ছু দরকার নেই।"
"আহাগো! ওঁর কিচ্ছু দরকার নেই, একেবারে মহাত্মা বনে গেছেন!"
বন্ধুকে প্রকৃতই রাগত হইতে দেখিয়া বিনয় তাহাকে শান্ত করিবার
অভিপ্রায়ে আদরমাখা কোমল স্বরে বলিল "সত্যি সত্যি রাগ করলি
সুধীর!—তুই তো বড় পাগল!—ঠাট্টা করে একটা কথা বল্লুম, নইলে
কোথায় কি তার ঠিক নেই, এ যে গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল!" সুধীর
কতকটা ঠাণ্ডা হইয়া বলিল "এমন সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

যাই হক্, কাল কিন্তু আমি নিমন্ত্রণ রক্ষে করতে পারব না, এখন থেকেই বলে রাখলুম।"

বিনয় ব্যস্ততার সহিত বলিল "সে কি কথা? না গেলে ভদ্রলোক কি মনে করবেন বল্ দেখি?—এ যে তোর অন্যায় কথা সুধীর!" সুধীরকে নিরুত্তরে ভাবিতে দেখিয়া বিনয় আবার অনুনয়ের সুরে বলিল—"আমি মেসে কাউকে একথা ঘৃণাক্ষরেও জান্‌তে দেব না, কেউ জিজ্ঞাসা কর্‌লে বল্‌ব বন্ধুর বাড়ী নেমতন্ন আছে। তা'হলে যাবি তো সুধীর? বল্ না?" সুধীর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। বন্ধু যুগলের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব ও সন্ধি স্থাপিত হইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সুধীর ও বিনয় যোগেশ্বরবাবুর গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া প্রায় বৈকালের মুখে মেসে ফিরিবামাত্র মেসের অধিবাসীদিগের মধ্যে বেশ একটু সোরগোল চঞ্চলতা প্রকাশ পাইতে দেখা গেল। উপস্থিত যুবকবৃন্দের মধ্যে পরস্পর একটা কানাকানি, চোখ টেপাটিপি ও চাপাহাসির ধূম পড়িয়া গেল।

কেহ বলিল "বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্নটা কি রকম খেলে সুধীর?" কেহ "আজই কি একেবারে পাকাপাকি করে এলে নাকি?" কেহ বা সুধীরের হাতখানি ধরিয়া সনির্বন্ধে মিনতি করিয়া বলিল "আমাদের সব বরযাত্রী হয়ে সঙ্গে যেতে দিবি তো ভাই?" বেচারা সুধীরকে হতভম্বের মত নির্ব্বাক দেখিয়া একজন শ্লেষ করিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিল "তোমরা সব কেন বৃথা সাধাসাধি করে মরছ? সুধীর কি এখন তোমাদের মত তুচ্ছ লোকের সঙ্গে কথা কইতে পারে: হুঁ! যে সে লোক তো নয়, একেবারে রাজার জামাই হতে চল্ল! একেই বলে পুরুষের ভাগ্য!"

তাহারা প্রায় সকলেই সুধীরের চেয়ে বয়সে বড়, সুতরাং প্রব[illegible] কাহাকেও কিছু বলিতে না পারিয়া সে রাগে গুম্ হইয়া রোষভরা জ্ব[illegible] দৃষ্টিতে বিশ্বাসঘাতক বিনয়কে যেন ভস্ম করিতে উদ্যত হইল। বন্ধু[illegible] নীরব শাসন উপেক্ষা করিয়া বিনয় কৌতুকভরে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "তা এত রাগ করছিস্ কেন ভাই? কথাটা তো নেহাত মিথ্যে নয়! মিথ্যে হলে এত সব খুঁটিনাটি পরিচয় নেবার কি দরকার পড়েছিল বল্? নেমন্তন্ন তো আমিও খেয়ে এলুম, তোর চেয়ে ঢের বেশীই খেয়েছি, তবু সে ভদ্রলোক এই হতভাগার নাম ধাম ঠিকানা তাঁর নোট বুকে যত্ন করে লিখে রাখ্লেন না তো?—আর তোরই বা কেন—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তরল হাস্যোচ্ছ্বাস ও হর্ষ কলরবে সমস্ত ছাত্রাবাস আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। "সত্যি নাকি? তা হলে তো কেল্লা ফতে বল! হুররে হুররে! আজ আমাদের সুধীরবাবুর কপাল ফিরেছে—" বলিয়া সমবেত ছাত্রমণ্ডলী স্তম্ভিত সুধীরকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া ঘন ঘন করতালি সহকারে তাণ্ডব নৃত্য বাধাইয়া তুলিল।

সাত।

বন্ধুগণের কাছে আস্ফালন ও রীতিমত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আসিলেও পরদিন সুধীর বাড়ী পঁহুছিতেই যখন পুষ্পরাণী "কই দাদা রাঙ্গা বউ কই?" বলিয়া অন্যান্য বারের মতই হাসিভরা মুখে ছুটিয়া আসিল, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুধীরের স্মৃতিপথে নিমেষের তরে ভাসিয়া উঠিল সেই বাতায়ন মধ্যবর্ত্তিনী ক্ষণদৃষ্টা কিশোরীর অনুপম লাবণ্য ও সুষমায় ঢল্ ঢল সুন্দর কোমল মুখখানি! আর সেই প্রভাতের শুকতারার মত নির্ম্মল উজ্জ্বল শান্ত নয়ন দুটীর সরম চকিত মধুর দৃষ্টিটুকু!

তাই সুধীর রঙ্গময়ী চপল স্বভাবা বোন্‌টীর সেই আদরমাখা আব্‌দারটুকু আজ আর হাসিমুখে উড়াইয়া দিতে পারিল না। নিজের অবিবেচনায় নিজেই লজ্জিত হইয়া সে একটু গম্ভীরভাবে কহিল "ও কথাটা বল্‌তে কি কোনও দিনই ভুলবি না রাণী?"

কিন্তু রাণী ভুলিবার মেয়ে নয়, সে যখন তখন ঐ কথাটাই বলিয়া দাদাকে ক্ষেপাইতে আরম্ভ করিল।

সুধীর বাড়ী আসিবার পর প্রায় দশ বারো দিন অতিবাহিত হইয়াছে। এ কয়দিন তাহার কর্ম্মহীন অবসর ছোট বোন বেলারাণীর সহিত খেলা করিয়া, মামীমার কাছে তাহাদের মেসের বামন ঠাকুরের অপরূপ বিচিত্র রন্ধনবিদ্যায় পরিচয় দিয়া, পুষ্পর কাছে প্রিয়বন্ধু বিনয়ের সহোদরাধিক স্নেহ যত্ন ও দুষ্টামীর বিষয় বর্ণনা করিয়া বেশ সহজেই কাটিয়া গেল, তারপর কিন্তু দিনকাটান যেন ভার হইয়া উঠিল। পরীক্ষার ফলাফল

বাহির হইবার এখন শীঘ্র সম্ভাবনা নাই, ততদিন ধৈর্য্য ধরিয়া সুধীর যে কি করিয়া সময় কাটাইবে, সেই এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

নিদাঘের নির্মেঘ নির্ম্মল অপরাহ্ন, পশ্চিমে ঢলিয়া পড়া শ্রান্ত তপনের উজ্জ্বল স্বর্ণকিরণধারায় অভিষিক্ত হইয়া যেন আনন্দে ঝল্‌মল্ করিতেছিল।

দূরে, বহুদূরে—ঈষৎ রক্তাভ কোমল নীল গগনের কোলে একটা শঙ্খচিল মনের আনন্দে উড়িয়া উড়িয়া ক্রমাগত পাক খাইতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী পোড়ো কুঠির উদ্যান হইতে এক একবার ভাসিয়া আসিতেছিল একটা আম্রমুকুলের বন সৌরভমুগ্ধ, আতপতাপক্লিষ্ট কোকিলের ক্লান্তবিহ্বল কণ্ঠস্বর কুউ কুউ! কুহু কুহু কুহু! নীরদা রান্না ঘরে কাজে ব্যস্ত। পুষ্প ছোট বোন্‌টীর ঝুম্‌রো ঝুম্‌রো খাটো চুলগুলিতে গুছি দিয়া বেণীবন্ধন করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছিল।

সুধীর তাহার নির্জ্জন ঘরটীতে একাকী পড়িয়া রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদখানি বুকের উপর রাখিয়া নীরবে ভাবিতেছিল তাহার আশাহীন অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা। যদি ভাগ্যক্রমে এবার সে পাশ হইতে পারে—কিন্তু পাশ হইয়াই বা কি লাভ?—এই সহায় সম্বলহীন বিশাল সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার মত যোগ্যতা সে অর্জ্জন করিবে কেমন করিয়া? তাহার নিরালম্ব নিরুদ্দেশে দীর্ঘ জীবনযাত্রার পাথেয় সে পাইবে কোথায়?

নিরীহ মাতুলের বুকের রক্ত দোহন করিয়া সে আর কতকাল তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিবে? ভাবিতে ভাবিতে সুধীর ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় একটা চাপাহাসির মৃদু কলোচ্ছ্বাসে তাহার সেই জটপাকান চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

"ওগো দাদা গো! বড় মজা! বড় মজা!" বলিতে বলিতে পুলকোচ্ছ্বসিত চঞ্চল নির্ঝরিণীর মত পুষ্পরাণী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সুধীরের বিছানার উপর হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাহার হাসির ঘটা দেখিয়া সুধীর স্নেহ প্রফুল্লমুখে জিজ্ঞাসিল "এত হাসির ধুম পড়ে গেছে কেন রে রাণী? হয়েছে কি?" কিন্তু দুর্দ্দমনীয় হাস্যাবেগে পুষ্প কথা কহিতে পারিল না, মুখে কাপড় চাপা দিয়া সে কেবলই হাসিতে লাগিল।

সুধীর তাহার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া স্নেহ ভরে কহিল "পাগ্‌লী কোথাকার। বলবে না কিছু না, কেবল ক্ষেপার মতন হাসবে! মজাটা কিসের হ'ল তাই বল্ না।"

পুষ্প উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ কষ্টে রোধ করিয়া বলিল "বল্লে আমায় কি দেবে, তা আগে বল তুমি।"

একটা সুসংবাদ প্রাপ্তির আশায় উন্মুখ হইয়া সুধীর ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল "কি হয়েছে বল না লক্ষ্মী, আমার পাশের খবর এসেছে নাকি? কিন্তু এত শীগ্‌গির রেজাল্ট্ আউট হবার তো কথা নয়—"

পুষ্প এবার সোজা হইয়া বসিয়া আরক্ত মুখ চক্ষু আঁচলে মুছিতে মুছিতে রহস্য ভরে কহিল "না গো দাদা, এ তা'র চেয়েও ঢের—ঢের বেশী সুখবর,—কিন্তু কিছু না দিলে বল্‌ছি না।"

আশা ভঙ্গে কিছু বিরক্ত হইয়া সুধীর বলিল "আর কি সুখবর থাক্‌তে পারে? তোর সব মিছে কথা রাণী! যাঃ আমার কাছে আর চালাকী করতে হবে না, এখন আমায় একটু পড়তে দে।"

"আহা গো! কি পড়াই পড়া হচ্ছিল ছেলের! বুকের ওপর বই রেখে, আকাশ পানে তাকিয়ে—আমি যেন কিছুই

দেখিনি !" বলিতে বলিতে পুষ্পরাণী পুনরায় হাসিতে আরম্ভ করিল।

এবার সুধীরও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে বোনটীর হাত ধরিয়া সাদরে বলিল, "লক্ষীটি আমার !—কি হয়েছে বল্ না ভাই ! খবরটা যদি সত্যিই ভাল হয়, তা হলে তুই যা চাইবি তাই দেব।"

"—দেবে ? সত্যিই দেবে ?" বলিতে বলিতে পুষ্প তাহার আঁচলের ভিতর লুকানো একখানা নীল রংয়ের চৌকা খাম শুদ্ধ পত্র বাহির করিয়া সুধীরের কোলের উপর ফেলিয়া দিল।

পত্র খানা তুলিয়া লইয়া খামের উপরকার সুন্দর ছাঁদে লিখিত অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিতে দেখিতে সুধীর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল "এ সময় চিঠি কে দিয়ে গেলরে ?"

"বাবা এনেছেন, তাঁর আফিসের ঠিকানায় এসেছে দেখ্‌ছ না ?"

"হ্যাঁ তাই তো দেখ্‌ছি, মামা বাবু এরি মধ্যে এসেছেন নাকি ?"

"এরি মধ্যে ! বেলা যে আর নেই, তা হুঁস নেই তো !" বাবা যে অনেকক্ষণ এসেছেন।—এখন চিঠি খানা পড়ে দেখতো, কে লিখেছে।"

সুধীর বিস্ময় ও কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া খামের ভিতর হইতে চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিল। পুষ্পরাণী আব হাসি চাপিতে না পারিয়া সেই সুযোগে সরিয়া পড়িল।

সুধীর প্রথমেই চিঠির শেষ প্রান্তে পত্র লেখকের নাম স্বাক্ষর দেখিল ভবদীয়—শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। একটা আকস্মিক উত্তেজনা ও লজ্জায় তাহার কর্ণ মূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। পত্রের মর্ম্ম অনুমানে বুঝিয়া লইয়া সে নিজের মনেই বলিতে লাগিল ছি ছি, মামা কি মনে

করিয়াছেন!—আর মামীমা—সুধীর কি করিয়া তাঁহাদের কাছে মুখ দেখাইবে?

চিঠি খানা হাতে করিয়া সুধীর খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। উকীলবাবু প্রথমে বিস্তর বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন "আমি আমার জীবনের ও সংসারের একমাত্র অবলম্বন মাতৃহীনা কন্যার জন্য আপনার ভাগিনেয় শ্রীমান সুধীরচন্দ্র বাবাজীকে প্রার্থনা করিতে পারি কি? সেদিন অভাবিতরূপে শ্রীমানকে দেখিয়াবধি মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি, ভরসা করি ব্রাহ্মণকে বিমুখ করিবেন না।" আরও কত কি অবান্তর কথা।

পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া সুধীর দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহাকে একান্ত নিঃস্ব অসহায় জানিয়াই বুঝি এই ঐশ্বর্য্যের মোহ, সুখের প্রলোভন দেখান হইয়াছে! কিন্তু সুধীর তো ভুলিবার পাত্র নহে! বড় লোকের ঘর জামাই রূপে তাহাদের অনুগ্রহ জীবী হইয়া নিজের সমস্ত স্বাধীনতা ও সত্বা নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া ক্রীতদাসেরও অধম হইয়া বাঁচিয়া থাকা, সে যে বড়ই লজ্জার, বড়ই ঘৃণার কথা। অন্ততঃ সুধীরের তো তাহাই বিশ্বাস।

কিন্তু সেই নিমেষের দেখা, কৈশোরের মধুর সুষমা মাখা সুন্দর মুখ খানি—সুধীরের তরুণ চিত্তের নব জাগ্রত যৌবনের সমস্ত আশা পরিকল্পনা দিয়া গড়া, সেই অনুপম মধুর মুখখানি! সে যেন তাহার কতদিনের পরিচিত, কত যুগযুগান্তরের সাধনার ধন, সে মুখ আজ আবার নূতন করিয়া সুধীরের আশামুগ্ধ বিহ্বল প্রাণে জাগিয়া উঠিল।

দোটানার স্রোতে পড়িয়া সুধীর যখন হাবুডুবু খাইতেছিল, তখন নীরদা আসিয়া প্রসন্নস্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানা পড়লে সুধীর ?"

সুধীর অধোবদনে উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"উনি জিজ্ঞেসা কর্‌লেন এ চিঠির উত্তরে—"

"কে মামাবাবু? ছি ছি, চিঠিখানা পড়ে তিনি কি ভাবছেন, কে জানে! আমি যে আর তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পারব না মামীমা ?"

সুধীরের অসম্ভব লজ্জা দেখিয়া নীরদা সস্নেহ হাস্যে কহিল, "দেখ দেখি ছেলের রকম! ওরে পাগ্‌লা! লোকের আইবুড় ছেলে মেয়ে ঘরে থাক্‌লেই যে বিয়ের সম্বন্ধ এসে থাকে, এতো আর নতুন কথা নয়? তার জন্যে এত লজ্জা সঙ্কোচ করাই বা কেন? উনি তো চিঠি পড়ে অবধি আহ্লাদে ডগমগ হয়েছেন, বলেন আমাদের সুধীরের খুব ভাগ্যবল আছে, নইলে এমন রাজার ঘর থেকে যেচে সম্বন্ধ এসেছে—ও রকম মাতব্বর শ্বশুর হলে, আর সুধীরের ভাবনা কি! সকল দিকেই কত সুবিধে—"

বাধা দান করিয়া সুধীর অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "মামীমা!"

"কি বাবা!"

"মামাবাবুকে বলো না, তাঁদের আফিসে আমার একটা কাজ টাজের যোগাড় যদি করে দিতে পারেন, তা'হলে—"

সুধীরের বি-এ পড়িবার জন্য কতখানি আগ্রহ তাহা নীরদা জানিত, তাই সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি সুধীর ; বি-এ পড়বে না আর ?"

মেয়ের বাপ।

"না মামীমা, তোমার ভাগ্নে গরীব হ'লেও রাজার ঘরে বিক্রী হতে পারবে না!"

মামীমা গালে হাত দিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ও মা আমি কোথায় যাব! ছেলের কথা শোন! তাদের ঘরে তুই বিক্রি হতে যাবি কেনরে পাগলা, বরং কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করে তাদেরই কিনে রাখ্‌বি, তা বুঝি জানিস্ না? হুঁ, যত বড়ই রাজার ঘরের হোক্ না কেন, মেয়েই তো! মিন্সে কত কাকুতি মিনতি করে লিখেছে, দেখ্‌ছ না?"

সুধীর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "কন্যাদায় তাদের হয়, মামীমা যাদের অর্থবল নেই, কিন্তু এতো সে রকম নয়, পয়সা তো অজস্র আছেই, তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কি সুধীর?"

সুধীর লজ্জাবনত মুখে নিরুত্তর। তাহার মনের কথা অনুমানে বুঝিয়া, নীরদা সহাস্যে কহিল, "কর্ত্তা তেমন কাঁচা লোক ন'ন বাবা, তিনি নিজের চোখে মেয়েটীকে বেশ করে দেখে শুনে তবে কথা দেবেন বলেছেন, সে জন্যে তোমার চিন্তা নেই। হুঁ, শুধু টাকায় কি হয় বাবা, আসল জিনিষ যা, সেইটীও যে ভাল হওয়া চাই, তা কি আর আমরা বুঝি না?"

মামীমার কথায় সুধীরের হাসি আসিল, দেখা শোনার কি আর বাকী আছে কিছু? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! নইলে সেদিন সেই আসন্ন দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া সুধীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহির হইবে কেন? কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যলাভের সম্ভাবনায় সুধীরের সংশয়জড়িত দ্বিধাগ্রস্ত

মন আশানুরূপ সুখী হইতে পারিল না। ধনী পিতার একমাত্র আদরিণী দুহিতা, সেই অসামান্যা রূপবতী কিশোরী, সুধীরের দুর্ভাগ্যক্রমে, সে যদি স্বামীর অবশ্য প্রাপ্য শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তাহাকে না দিতে পারে, দরিদ্র স্বামীকে যদি সে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষেই দেখে, তাহা হইলে বিপুল-বিত্ত, প্রভূত প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াই কি সুধীর প্রকৃত সুখী হইতে পারিবে? না, না, তাহা অসম্ভব। কিন্তু অমন লক্ষ্মীর মত কমনীয় শ্রী যা'র, সেও নাকি এমন হৃদয়হীনা হইতে পারে? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সুধীর তাহার এখনকার কর্ত্তব্য ভাবিতে লাগিল।

তাহাকে মৌন দেখিয়া নীরদা ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "বেশ করে ভেবে দেখ সুধীর, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌তে নেই। আমাদের যা অবস্থা তা তো জানো-ই বাবা,—ওখানে বিয়ে হলে যে, সব দুঃখু ঘুচে যায়, সেই জন্যেই তো কর্ত্তার এত আগ্রহ—সাত তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন, তোমার মতামত জান্‌তে—"

সুধীর খানিক চিন্তা করিয়া বলিল,—"তা হলে তোমাদের যা ভাল বিবেচনা হয় করো মামীমা, কিন্তু শেষকালে যেন আমাকে দোষী করো না, বড়লোকের ঘরের মেয়েরা কি রকম হয়, সেটা জানো না বলেই আমাকে এমন—"

পুষ্প এতক্ষণ লুকাইয়া মাতা ও ভ্রাতার কথোপকথন শুনিতেছিল, এক্ষণে আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সে দ্রুত চঞ্চল গতিতে ঘরে ঢুকিয়া সুধীরের হাত দুখানা ধরিয়া আগ্রহভরা পুলকিত স্বরে কহিল, "তুমি সে ভয় করো না দাদা, আমার বউদি কখনো সে রকম

হবে না, সে খুব লক্ষ্মী হবে দেখো—তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বল বিয়ে কর্‌বে?”

মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নীরদা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, “এই এক ক্ষেপা মেয়ে! একে নিয়ে আরও ভাবনায় পড়েছি বাবা, মেয়ের জাত যেন হুস্ হুস্ করে বেড়ে উঠ্‌ছে, মেরে কেটে আর একটা বছর রাখা যাবে, তারপর তো এটারও একটা গতি না করলে চলবে না।”

প্রীতিময়ী সরলা বালিকার পানে সস্নেহ নয়নে চাহিয়া সুধীর হাস্যরঞ্জিত মুখে বলিল, “রাণীর জন্য তুমি ভেব না মামীমা, ওর সম্বন্ধ আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি।”

“সত্যি? কার সঙ্গে বাবা?”

নীরদা উত্তর প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাসে চাহিয়া রহিল।

সুধীর বলিল, “আমার বন্ধু বিনয়ের কথা শুনেছ তো? দিব্যি ছেলেটী, আমার উপরোধ সে কখনই ঠেল্‌তে পারবে না, আর আমাদের রাণীও তো নেহাত ফেল্‌না মেয়ে নয়, দেখতে শুনতে সকল রকমেই—”

লজ্জিতা পুষ্পরাণী এবার রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, যাইবার সময় কিন্তু সুধীরকে একটা ছোট রকম “কিল” দেখাইয়া যাইতে ভুলিল না।

আট।

"আমাদের মণির বিয়ে কি ঐ ছেলেটীর সঙ্গেই ঠিক করলে যোগু?"

"হ্যাঁ, কেন দিদি! ও পাত্র কি তোমার পছন্দ সই নয়?"

"না, না, সে কথা বল্‌ছি না আমি, আহা দিব্যি ছেলে, খাসা ছেলে, যেন রাজপুত্তুরটী!—আর মুখখানি দেখলেই কেমন মায়া হয়। তা'র ওপর আবার মা বাপ নেই শুনছি, তা'র জন্যে ছেলেটী আরও আত্মিসুয়ো হতে পারে।"

"তবে তোমার আপত্তিটা কিসের দিদি?"

যোগেশ্বর বাবু এবং তাঁহার বিধবা জ্যেষ্ঠা সহোদরা মহামায়া, উভয়ের মধ্যে উপরোক্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আপত্তিটা যে কিসের তাহা ঠিক ধরিতে না পারিয়া, মহামায়া বড় সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। পরম স্নেহের পাত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রী মণিকার এই শুভ বিবাহ বার্ত্তায় আজ মহামায়ার যেন নূতন করিয়া মনে পড়িতেছিল, তাঁহার সব পাওয়া, আবার সব হারাণো,—নিষ্ফল ব্যর্থ জীবনের কথা।

তিনিও এককালে স্নেহময় পিতামাতার আদরিণী কন্যা ছিলেন, ভাল ঘরে, ভাল বরে বিবাহ দিলেও তাঁহারা আদরের মেয়েটীকে অতিরিক্ত স্নেহবশে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া, বেশীদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না, সেজন্য মহামায়ার অদৃষ্টে স্বামী সন্দর্শন সুখ বিশেষ সুলভ ছিল না। সেই সংক্ষিপ্ত সুখের দিনগুলি তাই মহামায়ার বিবাহিত জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাসের পাতায় পাতায় শুধু অস্পষ্ট

রেখাপাত করিয়াছে মাত্র, ভাল করিয়া, ফুটিবার সময় বা সুযোগ পায় নাই। তাঁহার সুখ স্বপ্নে ভরা তরুণ যৌবনে কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষা যে অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে,—কত নিভৃত অলস মধ্যাহ্ন, কত জ্যোৎস্না বিধুরা মধুর চাঁদিনী যামিনী,—কত বর্ষণ মুখর কাজল মেঘে ছাওয়া বাদল সন্ধ্যা,—কত দুর্লভ মধুময় মিলন মুহূর্ত্ত যে ব্যর্থ বিফলে গিয়াছে, আজ জীবনের উপকূলে বসিয়া মহামায়া তাহার সংখ্যা রাখিতে অক্ষম। কিন্তু এখনো, প্রাণের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সমাধি হইয়া গেলেও, সেই ব্যর্থতার বেদনা, বিধবার সর্ব্বহারা বিরাগী শ্রান্ত হৃদয়খানিকে সময় সময় বড় ব্যথিত, পীড়িত করিয়া তুলিত।

নারী জীবনের ইপ্সিত সুখ যতটুকু বিধাতা অদৃষ্টে মাপাইয়াছিলেন। মন্দভাগিনী তিনি, যদি সেটুকুও নিঃশেষে, প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয় তো আজ তাঁহাকে এতখানি দুঃখ ও পরিতাপ ভোগ করিতে হইত না।

জ্যেষ্ঠাকে নীরব দেখিয়া যোগেশ্বর উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "তোমার মনোগত ইচ্ছে কি, তাই বল না দিদি। এ বিয়েতে যদি তোমার কোনও আপত্তি থাকে তা'হলে না হয়—"

মহামায়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, না, আপত্তি টাপত্তি আমার কিছুই নেই ভাই, তবে মনটা একটু খুঁত খুঁত করছিল কেন জানো? ও ছেলেটার বাপ মা, বাড়ী ঘর দুয়োর কিছুই যে নেই শুনছি, মেয়েটা যে দুদিন গিয়ে থাক্‌বে, সে—"

বাধা দিয়া যোগেশ্বর ত্রস্তে কহিলেন, "মেয়ে আমার শ্বশুরবাড়ী যাবেই বা কেন দিদি! আমার মণিকে আমি প্রাণ ধরে পরের ঘরে

পাঠাতে পারব না বলেই তো এ সম্বন্ধে রাজি হয়েছি। নইলে পয়সা ফেল্লে সুপাত্রের অভাব কি বল?”

“তাতো বটেই, তবু মেয়ে মানুষের শ্বশুরবাড়ীই হল গে—”

“না না দিদি, আমার মণিমাকে চোখের আড়াল করে আমি কখনই বাঁচব না, ঐ টুকু সম্বল নিয়ে যে আজও এ শূন্য সংসারে রয়েছি দিদি!” বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠস্বর গাঢ় কম্পিত হইয়া আসিল। মহামায়ারও চক্ষু দুটী অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া উঠিল। ভ্রাতার কত দুঃখের কত আরাধনার ধন ঐ মণিকা, শৈশবে মাতৃহারা হইয়া শোকাতুর পিতার সে যেন প্রকৃতই নয়নমণি হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ মেয়েটীর মুখ চাহিয়া, যোগেশ্বর যে সহস্র অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও দারান্তর গ্রহণ করেন নাই। ভরা যৌবনে সংসারের সকল সুখ সাধে জলাঞ্জলি দিয়া, সকল ভোগলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেছেন, তাঁহার মত প্রভূত ধনৈশ্বর্য্যের সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া কে এমনটী করিতে পারে? অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! নহিলে মণির পূর্ব্বে আরও তো দুটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে ঐ মেয়েটুকুর জন্য মাথা খুঁড়িতে হইত কেন?

এখন মণি ভিন্ন যোগেশ্বরের উদাসীন জীবনে আর যে কোনও বন্ধন কোনও অবলম্বন নাই, তবে সেই সবে ধন নীলমণির জন্য ঘরজামাই রাখার বাসনা ভ্রাতার কি অসঙ্গত হইয়াছে? মনে মনে অনুতপ্ত হইয়া মহামায়া বাহ্যিক প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন, “তা বেশ তো ভাই, মণির বিয়ে তা হলে ঐখানেই পাকাপাকি করে ফেল, আর দেরি করে

কাজ নেই। আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে ছেলেটীকে খুব শান্ত শিষ্ট বলেই মনে হ'ল, ওকে নিয়ে তোমার ছেলের সাধও পূর্ণ হবে, আর মণিকেও চক্ষের অন্তর কর্‌তে হবে না, সেই বেশ হবে যোগু!"

বাস্তবিক তাহাই হইল। আষাঢ়ের প্রথম শুভলগ্নে কাশীধামের স্বনামখ্যাত যোগেশ্বর উকীলের সমগ্র বিষয় বিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী মণিকা দেবীর সহিত সুধীরের শুভ পরিণয় কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল।

এতদুপলক্ষে সুধীরের মেসবাসী বন্ধুবর্গ উপর্য্যুপরি কয়েক দিন উকীল গৃহে নিমন্ত্রণ লাভ করিয়া চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি বিবিধ ভূরি ভোজনে তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়া নবদম্পতীকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। সুধীরের শ্বশুর দত্ত নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে তাহার মাতুল মহাশয়ের ক্ষুদ্র গৃহখানিতে নঃ স্থানং তিল ধারণং হইয়া দাঁড়াইল।

নীরদা হাসিভরা প্রসন্নমুখে সেই সকল মহার্ঘ দ্রব্যাদি বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখিয়া ও আর দশজনকে দেখাইয়া বড় ঘরে কুটুম্বিতা করার সাধ মিটাইতে লাগিল। . আর পুষ্পরাণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাহাদের পরীর মত সুন্দর রাঙ্গা বউটীকে সকলকে দেখাইয়া ও বধূর অসামান্য রূপের শত মুখে প্রশংসা শুনিয়া গর্ব্বে স্ফীত, উল্লসিত হইয়া উঠিল।

নববধূ মণিকা তাহার নবলব্ধ তরুণ বন্ধুটীর বিমোহন রূপ ও স্নেহ-কোমল মধুর আচরণে অতিশয় মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শ্বশুর গৃহের দীনতা ও হীন অবস্থা সেই আবাল্য সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা ধনী দুহিতাকে আনন্দ দান করিতে পারিল না। মণি মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিলেও মনে মনে বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই তাহার

শ্বশুরালয়! একতালা ছোট্ট বাড়ীখানি, অপরিসর ঘরগুলার সঙ্কীর্ণতা যেন বুক চাপিয়া ধরে,—গোবর ন্যাপা মেঝের উপর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত খাইতেও যেন বমি উঠিয়া আসে!—মা গো মা!—এই রকম বাড়ীতে, এত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সে থাকে কেমন করিয়া? মণিদের বাড়ীর ঝি চাকরেরা যে সব ঘরে বাস করে, সেও যে ইহার তুলনায় শত গুণে শ্রেষ্ঠ!

মণির বড় ভাগ্য যে এ বাড়ীতে তিনটি দিনের বেশী তাহাকে থাকিতে হইবে না, কারণ বিদায় কালে তাহার বাবা, পিসীমা, দুইজনেই স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, মণিকে আর সাধারণ মেয়েদের মত ভবিষ্যতে শ্বশুর ঘর করিতে হইবে না, তাই রক্ষা! চোখ কান বুজিয়া মাত্র তিনটি দিন কাটাইয়া দেওয়া কিছু বেশী কথা নয়। তা'ই যদিও নীরদার স্নেহাদরে মণির পিসীমার কথা মনে পড়িত এবং কোমলতাময়ী মধুর স্বভাবা পুষ্পরাণীর আদর ও ভালবাসায় বিদায় কালে তাহার নিজের চক্ষু দুটিও সজল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তিন দিন পরে মণিকা যখন তাহার চির পরিচিত পিতৃ ভবনে ফিরিয়া আসিল, তখন যেন সে প্রকৃতই হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

নয়।

সুধীর আবার সেই কুইন্স কলেজেই বি-এ, পড়িতেছে, কিন্তু এবার আর মেসে থাকিয়া নয়।

রাজপ্রাসাদ তুল্য শ্বশুর ভবনে রাজ সুখ ভোগের মধ্যে বাস করিয়া, সে নিশ্চিন্ত মনে সরস্বতীর আরাধনা করিতেছিল।

কিশোরী পত্নীর মমতা ভরা সরল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া, সুধীরের মনের সকল সংশয় ও ভীতি বিদূরিত হইয়াছিল। তাহার জীবনের সৌভাগ্য লক্ষ্মীরূপিনী মণিকার মধুর সাহচর্য্য ও প্রাণঢালা ভালবাসা সুধীরের তরুণ প্রাণে যেন স্নেহময় সুখস্বপ্ন ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু বন্ধু বিনয়ের উপদ্রব এখনও অব্যাহত ছিল। সে কারণে অকারণে আসিয়া পড়িয়া এক একদিন সুধীরকে তাহার তরুণী সঙ্গিনীর লোভনীয় সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাদের ছাত্রাবাসে টানিয়া লইয়া যাইত এবং বামুন ঠাকুরের যত্ন প্রস্তুত খাদ্য বা অখাদ্য সুধীরকে জোর করিয়া গিলাইয়া দিয়া, তাহার বদলে মাসের মধ্যে দশ দিন উকীল বাবুর গৃহে রাজ ভোগে উদর পূর্ত্তি করিয়া রসনার তৃপ্তিসাধন করিত।

এইরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আমোদ প্রমোদের মধ্যে সুধীরের জীবনের একটি বৎসর সোনার জলে লেখা কবিতার মধুর সুললিত ছন্দের মত, মধু যামিনীর সুপ্তিভরা সুখালস স্বপ্নের মত অতিবাহিত হইয়া গেল। সেই দীর্ঘ অবকাশে যাদুকর যৌবন তাহার মোহময় মোহন তুলিকাখানি বুলাইয়া দিয়া সেই দুটি তরুণ তরুণীর সুকুমার দেহ ও মন যেন মধ্যাহ্নের

রবিকর স্পর্শে উৎফুল্ল স্থলপদ্মের মত পূর্ণ শোভায় বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রীতিবিমুগ্ধ দম্পতী যুগের প্রণয় বন্ধন দিনে দিনে আরও দৃঢ় ও নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছিল।

সুধীর প্রথম প্রথম অল্পদিনের ছুটিতেও গাজিপুরে গমন করিত। তাহার এই ঘন ঘন বাড়ী যাওয়ায় শ্বশুর মহাশয় যেন একটু বিরক্তিরভাব প্রকাশ করিতেন, কেন তাহা ঠিক বলা যায় না। জামাতার প্রতি তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না, বরং বিনীত নম্র প্রকৃতি সুধীর অপুত্রক শ্বশুরের পুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই কারণেই, পরের ছেলেকে আপন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ বশতঃ যোগেশ্বর বাবুকে এই অতিরিক্ত স্নেহের সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

তাহার উপর আবার পত্নীর মান অভিমান আছে। প্রিয়তম দয়িতের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ প্রয়াসিনী, স্বামী প্রেমে বিভোরা মণিকা, তাহাকে এক দণ্ড ছাড়িতে চাহে না। তাহার বিরহে কাঁদিয়া আকুল হয়। সুতরাং বাধ্য হইয়াই সুধীরকে বাড়ী যাইবার বাসনা প্রায়ই ত্যাগ করিতেই হইয়াছিল। যোগেশ্বর বাবু জামাতার এই সুমতি দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং বৈবাহিক গৃহে নিত্য নূতন উপঢৌকন সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের মনঃক্ষোভ নিবারিত করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইতেন। ইহাতে সুধীরের মামীমাতা বিশেষ আনন্দিত হইলেও মামা অবিনাশ বাবু মনে মনে কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। নীরদা স্বামীকে প্রবোধ দিয়া বলিত, "তোমার ভাগ্নে যে, সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে রাজার হালে দিন কাটাচ্ছে তা'তো তার নিজের মুখেই শুনেছ? তবে তুমি

কেন মিছে মন খারাপ করো? সে যেখানে আছে সেইখানেই সুখে থাক্ না বাপু, তোমার গরীবের ভাঙ্গা কুঁড়েয় দুঃখ পেতে নাই বা এল!"

পুষ্প কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। সে "দাদা তুমি কবে আসবে? এবার কিন্তু একলাটী এলে চলবে না, আমার লক্ষ্মী বউদি মণিকেও সঙ্গে করে আনতে হবে, নইলে তোমাদের দুজনকারই সঙ্গে আমার 'আড়ি,'—এইরূপে আসিবার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিয়া সুধীরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সপ্তমীর চাঁদখানি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সঞ্চিত অনাবিল শুভ্র জ্যোৎস্নাধারা নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে কখন পশ্চিম দিগন্তে ডুবিয়া গিয়াছে।

সংসারের সমস্ত কোলাহল নিস্তব্ধ। সারাদিনের কর্ম্মাবসানে গল্প গাছা শেষ করিয়া ধনী গৃহের দাস দাসীরাও এখন নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু সুধীর তখনও শয়ন করিতে যায় নাই, পাঠাগারে একাকী বসিয়া সে পড়িতেছিল এবং পড়িতে পড়িতে এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া কি জানি কি ভাবিতেছিল। সহসা তাহার সাম্‌নে খোলা বইখানির উপর কাহার ছায়া আসিয়া পড়িল এবং দুইখানি পেলব করপল্লব চক্ষের উপর পড়িয়া সুধীরের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করিয়া দিল।

আগন্তুকের রত্ন খচিত স্বর্ণচুড়ী বেষ্টিত গোলগাল নরম হাত দুখানা ধরিয়া ফেলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই যে—এরি মধ্যে টনক্ নড়েছে? আমি বলি মণি আমার ঘুমিয়েছে বুঝি?"

"মণির চোখে ঘুম কি তুমি রেখেছ?"

"কেন গো! তোমার চক্ষের ঘুম কি আমি সঙ্গে করে বেঁধে এনেছি নাকি?"

"সে কথা কি মিছে? তাইতো আমি চুপি চুপি চোরের মত এসেছিলুম, আমার ঘুম ফিরিয়ে নিয়ে যেতে—"

"চোরের এই শাস্তি"—সুধীর তাহার প্রেম নিবিড় বাহুবেষ্টনে বন্দী করিয়া মণিকাকে চুরী করার শাস্তি ভাল মতেই প্রদান করিল। সেই গুরুতর শাস্তি দেওয়ার ঝোঁকে সম্মুখে ছোট টেবিলের উপর রাখা বই ক'খানি স্থান ভ্রষ্ট হইয়া হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। পতনোন্মুখ টেবিলটাকে শশব্যস্তে তুলিয়া সুধীর বইগুলি আবার গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। মণি বাধা দিয়া উপেক্ষা ভরে বলিয়া উঠিল, "থাক্ থাক্ ওগুলো এইখানেই পড়ে থাক্, আর তুলতে হবে না।"

মণির উত্তেজনারক্ত সুন্দর মুখখানির পানে সকৌতুকে চাহিয়া সুধীর হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আমার পড়বার বইগুলোর উপর তোমার এত আক্রোশ কেন বল দেখি মণি?—ও বেচারাদের কি অপরাধ—"

"অপরাধ?" ভিত্তি সংলগ্ন বড় অফিস ক্লক্‌টার দিকে অঙ্গুলী হেলাইয়া মণিকা বলিল, "ঘড়ীর কাঁটার দিকে চেয়ে দেখতো একবার ক'টা বেজেছে! আজ কি ঘুমোতে হবে না নাকি?"

সুধীর সহাস্যে কহিল, ওঃ! আজ রাতটা একটু বেশী হয়ে গেছে বটে, কিন্তু মণি, এখন একটু রাত না জাগলে চলবে কেন বল?—বি-এটা পাশ করতে হবে তো?—নাকি লেখা পড়া সব ছেড়ে ছুড়ে, একেবারে পুরো দস্তুর বড়লোকের ঘরজামাই বনতে হবে? তোমার কি তাই ইচ্ছে মণি?"

সুধীরের কথা বলিবার ভঙ্গীতে হাসি আসিলেও মণিকা তাহার ধনুকের

মত বাঁকা টানা ভ্রু দুখানি কুঞ্চিত করিয়া বিরাগের সহিত বলিল, "কে বলে তোমায় পড়া ছাড়তে? দিন ভোর পড়েও কি আশা মেটেনি, তাই অর্দ্ধেক রাত্তির পর্য্যন্ত জেগে বসে মিছে এই ভূতের বেগার খাট্‌ছ?"

"মিছে ভূতের বেগার!—বল্‌কি মণি?" মণিকার আপেলের মত লাল টুলটুকে গাল দুটো আদরে টিপিয়া দিয়া সুধীর বলিল, "তোমার রায় নিয়ে যদি গবর্ণমেণ্ট কাজ করতেন মণি, তা'হলে এদ্দিন স্কুল কলেজ সব কবেই না লোপ পেয়ে যেত, আর পড়ায় অমনোযোগী ডান্‌পিটে দুষ্টু ছেলে গুলো তোমাকে দুহাত তুলে মনের আনন্দে আশীর্ব্বাদ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচত!"

মণিকা এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল "দূর,—আমি কি তাই বলছি নাকি? আমার কি ইচ্ছে পৃথিবী শুদ্ধ লোক গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকে? তা নয়, তবে বেশীর ভাগ লোক পাশ করতে চায়, পয়সা উপার্জ্জন করবার জন্যে—কিন্তু তোমার তো সে সব বালাই নেই, শুধু জ্ঞান লাভের জন্যেই পড়া—নইলে তোমার অভাব কিসের? রাত জেগে পড়ে পড়ে মিছে শরীর খারাপ করে বি-এর ডিগ্রি নিয়ে কি হবে বলতো? চাকরী করতে তো হবে না?"

সুধীর মণিকার চাঁপার কলির মত সুন্দর অঙ্গুলীগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, "হবে, না হবে,—তা কে বলতে পারে?—এখনও তো সমস্ত জীবনই পড়ে আছে মণি!"

স্বামীর এই অসঙ্গত অপ্রিয় বাক্যে চমকিত হইয়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া মণিকা সাভিমানে কহিল, "ও আবার কি রকম কথা? তোমার আজকাল হয়েছে কি বল দেখি? ঐ জন্যেই তো বেশী রাত

জেগে পড়তে মানা করি,—মাঝে মাঝে পাগলের মত এমন সব কথা বলে বসবে যে তার মাথা মুণ্ডু নেই!”

মনের অস্থিরতা বশতঃ কথাটা অনিচ্ছাসত্ত্বে বলিয়া ফেলিয়া সুধীর বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া সে বলিল, “নাঃ! তুমি ঠিক বলেছ মণি! সেই অবধি একনাগাড়ে পড়ে পড়ে মাথাটা একদম গুলিয়ে গিয়েছে, চল এখন শুয়ে পড়া যাক, তোমারও ঘুম পেয়েছে খুব—”

“না না, আমার ঘুম এখন চটে গিয়েছে, তুমি আগে বল এ কথাটা আজ কেন বল্লে? কিসের দুঃখে তুমি চাকরী করতে যাবে?”

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল “এতো আচ্ছা পাগল দেখছি,—আমি কি সত্যিই চাকরি করতে যাচ্ছি? চাকরী কি আমার জন্যে বসে আছে মণি? একটা কথা অন্যমনস্কে হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, তাই নিয়ে এতখানি মাথা ঘামাবার দরকার কি বলতো?”

মণিকা কিন্তু অল্পে ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে সুধীরের হাত দুখান কোলের উপর চাপিয়া রাখিয়া উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, “যাই বল, ও কথাটা মনে না এলে তুমি কখনই মুখে আনতে পারতে না—বল, তোমাকে বলতেই হবে—”

বিব্রত সুধীর স্ত্রীকে আদর করিয়া মিষ্ট কোমল স্বরে কহিল, “এ সব মনস্তত্ত্বের কথা তোমাকে বোঝাবার মত বিদ্যে কি ক্ষমতা আমার তো নেই মণি, তাইতো বলি আমাকে খুব ভাল করে পড়ে পণ্ডিত

হতে দাও, নইলে এ গরীব মূর্খ স্বামীকে নিয়ে তোমাকে চিরদিন আক্ষেপ করতে হবে—"

মণিকা আর বলিতে দিল না, স্বামীর মুখের উপর হাত চাপা দিয়া সে অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আজকাল এমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে শিখেছ তুমি কার কাছে বলতো?—গরীব, মূর্খ, এ সব কথা কি আমি কোনও দিন ভুলেও তোমাকে বলেছি?"—পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া সুধীর আবার এক বিভ্রাট বাধাইয়া বসিল।

'গরীব' 'মূর্খ' এই সব হীনতাব্যঞ্জক বিশেষণগুলি সুধীরের মুখে অজ্ঞাতে আজ বাহির হইয়া গিয়াছিল, সেজন্য দুঃখিত হইয়া সে মণিকার অভিমানারক্ত মুখখানির পানে সপ্রেমে চাহিয়া বলিল, "তুমি না বল্লেও এ কথা আর পাঁচজনেও তো বল্‌তে পারে? তা'র জন্যে এত রাগ করছ কেন মণি? সত্যি তোমার বাবার দয়ায় আজ যেন আমার কোনও অভাব অভিযোগ নেই, কিন্তু এর পূর্ব্বে আমি যে গরীবের ছেলে গরীব ছিলুম, তা'তে কোনও সন্দেহ নেই; আর মূর্খ—" সুধীর মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "একেবারে অকাট মূর্খ না হলেও আমাকে তুমি দিন দিন যে রকম আয়েষি আর আল্‌সে কুঁড়ে করে তুল্‌ছ,—তাতে কোনও দিন যে বিদ্বান্ হতে পারব, তা তো মনে হয় না!"

মণিকা মুখ ভার করিয়া বলিল, "বেশ গো বেশ! আর আমি কক্ষনো তোমার পড়ায় বাধা দিতে আসব না,—তুমি পড়, সারারাত জেগে যত ইচ্ছে পড়, আমি চলে যাচ্ছি এখনি—"

বলিতে বলিতে মণি সত্যই উঠিয়া পড়িল। সুধীর তাহার হাত দুখানি খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া ব্যঙ্গ চপল হাস্যে বলিল, "যাও না,

তুমি এখনি যাও না, আমি ধরে রেখেছি নাকি ?"

. মণিকা হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে, "ছেড়ে দাও তবে তো যাব ? সত্যি ছেড়ে দাও না, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।"

"তবে এই না বল্লে ঘুম চটে গেছে ?"

"হ্যাঁ, তা তো গেছলই,—কিন্তু এখন পেয়েছে, ছেড়ে দাও শুয়ে পড়িগে,—আহা,—ছাড না !"

"এই যে ছাড়ছি তোমাকে—"

সেই মায়াময়ী প্রেমের প্রতিমাখানিকে বক্ষের ভিতর সাপটিয়া ধরিয়া সুধীর সোহাগ ভরা মধুর কণ্ঠে বলিল, "কোথায় যাবে যাও না, আমি কি তোমায় ধরে রেখেছি ?"

সেই সোহাগে, অনুরাগে গলিয়া গিয়া আদরিনী মণিকা উচ্ছ্বসিত গভীর সুখে স্বামীর হৃদয়ে কোমল লতার মত এলাইয়া পড়িল এবং সেদিনকার দাম্পত্য কলহের এই স্থলেই সমাপ্তি হইয়া গেল। স্বামীর প্রেমভরা বিশ্বস্ত বক্ষে মাথা রাখিয়া স্বামী সোহাগিনী গরবিনী মণিকা অনুরাগ পূরিত গদ গদ বচনে কহিল, "আমি তোমায় পড়তে বারণ করি না, তবে চব্বিশ ঘণ্টাই যদি পড়া নিয়ে থাক্‌বে, তা'হলে আমি পোড়ারমুখী কোথায় যাই বল ? আমার যে সময় কাটে না। বাবা অসুখ করবে বলে আমায় কোনও কাজে হাত দিতে দেবেন না, ধোঁয়া লেগে মাথা ধরবে বলে, পিসীমা রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় যেতে দেবেন না, আর তুমিও—"

"কেন মণি ? তোমার সময় কাটাবার ভাবনা কি ? তুমিও এই অবসরে ইংরাজীটা ভাল করে শিখে নাও না কেন ?"

"নাঃ, ইংরাজী পড়তে আমার একটুও ভাল লাগে না, আর বাঙ্গালীর মেয়ে ইংরিজী শিখে হবেই বা কি?"

"তা'হলে যাকৃগে,—কিন্তু তোমার সময় কাটাবার তো আরও অনেক জিনিষ আছে মণি? সে দিন যে কবিতাটা লিখ্‌ছিলে সেটা কি—"

মণিকা লজ্জিত হইয়া বলিল, "যাও! আমি আর কক্ষণো কবিতা লিখ্‌ব না, খাতাখানা ছিঁড়ে ফেলে দেব!"

"উঃ! একটুখানি লুকিয়ে দেখেছি বলে, এত রাগ! সত্যি মণি, কবিতা লেখায় তোমার বেশ হাত আছে, চেষ্টা করলে এক সময় বেশ ভাল কবিতা রচনা করতে পারবে। আচ্ছা তারপর, রবিঠাকুরের যে নতুন গানটা অর্গানে বাজাতে শিখ্‌ছিলে, সেটার সুর তাল সব ঠিক হয়েছে তো? গানটী আমাকে একদিন শোনাতে হবে কিন্তু।"

"ছাই শিখেছি,—আমার ও সব ভাল লাগে না!"

"হ্যাঁ, তাই তো এখন ওঠ, আজ কি সত্যই শুতে হবে না নাকি? রাত যে কাবার হয়ে এল।"

উভয়ে শয়ন কক্ষে আসিয়া শয্যা গ্রহণের অত্যল্প কাল পরেই সুধীর গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কিন্তু মণিকার চক্ষে আজ যেন ঘুম আসিতেছিল না। নিশীথ রাত্রে, সুখ সুপ্ত স্বামীর পাশে নীরবে শয়ন করিয়া মণিকা বিনিদ্র নয়নে ভাবিতে লাগিল, সুধীরের স্বভাবগত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা।

শুধু আজই নহে, এইরূপ কলহ বা মনান্তরের অভিনয় আজকাল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই চলিতেছিল, কিন্তু ইহার কারণ এখনও অজ্ঞাত।

স্বামীর মনের কোণে যে একটা কিসের বেদনা ও অশান্তি দিনে দিনে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, তাহা বুদ্ধিমতী মণিকার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্ন ব্যথাটুকু যে কিসের তাহা ধরিতে না পারিয়া, সে মনে মনে বিলক্ষণ চিন্তাকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

মণিকার পিতৃগৃহের এত যত্ন সমাদর ও সুখ সম্পদের মধ্যে থাকিয়া সুধীর নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করে না কেন? তাহার রূপ যৌবন ও ক্ষুদ্র হৃদয়খানির সমস্ত শ্রদ্ধা ভালবাসা নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াও মণিকা তাহার জীবনারাধ্যকে আশানুরূপ সুখী করিতে পারিতেছে না কেন? কি নির্ব্বোধ সে! স্বামীর মনের অসুখ কোন্‌খানে তাহা এত দিনেও বুঝিতে পারিল না! এতটুকু যোগ্যতাও ভগবান তাহাকে দেন নাই!

নিজের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার কথা মনে করিয়া, অনুতাপে দুঃখে মণিকার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সেই সময় সুষুপ্ত সুধীর একটুখানি সজাগ হইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল এবং তাহার অভ্যাসমত মণিকে নিদ্রা শিথিল বাহু পাশে বেষ্টন করিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইল।

সেই চির-বিশ্বস্ত স্নেহের আশ্রয়ে স্থান লাভ করিয়া মণিকা এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

দশ ঃ

"এমন অসময়ে শুয়ে আছ কেন বাবা? শরীরটা কি আজ ভাল নেই?

"হ্যাঁ, মা মণি! কাল রাত থেকেই শরীরটায় যেন কেমন অস্বস্তি ধরে আছে, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি তাই।"

"রাত্তির থেকে? কিন্তু আমাকে তা তো বলনি বাবা!"

"কি আর হ'ত মা ব'লে? এমন কিছু অসুখ তো হয়নি, মিছে সারা রাত জেগে বসে থাকৃতে,—আমার মা মণিটিকে আমি তো বেশ জানি!"

স্নিগ্ধ প্রফুল্ল নয়নে কন্যার উদ্বিগ্ন মুখের পানে চাহিয়া যোগেশ্বর বাবু স্নেহের হাসি হাসিলেন। কিন্তু মণিকার মুখখানি নিমেষে ম্লান হইয়া গেল। সে একদিন ছিল বটে, যখন পিতার একটুখানি মাথা ধরিলেও মণিকার উদ্বেগের সীমা পরিসীমা থাকিত না, কত ছোট খাট সেবা দিয়া সে প্রকৃতই স্নেহময়ী জননীর মত পীড়িত পিতাকে সুস্থ করিতে প্রয়াস পাইত। কোনও অনিবার্য্য কারণে যোগেশ্বর বাবুর কোনও দিন বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে বালিকা মণি, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ী মাথায় করিত। কিন্তু এখন,—হায় রে, অদ্ভুত নারী প্রকৃতি! কোথাকার কে এক অপরিচিত জন আসিয়া তাহার সমস্ত সময় ও হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে! ছায়ার মত অবিরত নিঃসঙ্গ পিতার কাছে কাছে থাকিবার অবকাশ এখন তাহার

কোথায়! মণিকার অসাধারণ একনিষ্ঠ পিতৃস্নেহ টলিয়াছে, আজ কিসের মোহে ভুলিয়া? পোড়া নারীর জীবন সত্যই বুঝি ভগবান্ শুধু পরের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন? তা'ই কি মণির বিবাহের দিন অত আনন্দ সমারোহের মধ্যেও তাহার স্নেহময় পিতা গোপনে অশ্রু মুছিয়া চক্ষু দুটী লাল জবাফুল করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তা'ই দেখিয়া পিসীমা "ওরে যোগু রে!—তোর আদরের মণিমা এবার যে পর হয়ে গেল রে!" বলিয়া আত্মীয়া কুটুম্বিনীদিগের নিষেধ ও সান্ত্বনা না মানিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছিলেন! হায়! বিধাতার একি আশ্চর্য্য অপরূপ বিধান!

ব্যথিত, অনুতপ্ত চিত্তে মণিকা পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কপালে হাত দিয়া বলিল, "কই, গা তো তেমন গরম বোধ হচ্ছে না, তবু একবার ডাক্তারকে ডেকে পাঠাব বাবা?"

"না মা, কিছু দরকার নেই, কুইনাইন আর এস্পিরিণ খেয়েছি, এ বেলা শুধু দুধ খেয়ে থাক্‌ব, তা'তেই সেরে যাবে'খন, গা টা একটু ম্যাজমেজে হয়েছে বই তো নয়।"

মণিকা আশ্বস্ত হইয়া পিতার মস্তকের কাঁচা পাকা চুলগুলিতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিল, "ও বাবা, এরই মধ্যে তোমার এতগুলো চুল পেকে গিয়েছে?"

"তা পাক্‌বে না?—তোর বাবা কি চিরদিনই কচি খোকা হয়ে থাকবে রে পাগলী?—আর পাকা চুল বেছেও তো দিসনি কতকাল!"

কথাটা যোগেশ্বর বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেও মণিকার মর্ম্মস্পর্শ করিল। আবার একটা ব্যথা পাইয়া সে অধোবদনে কহিল, "তুমি

একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো বাবা, আমি তোমায় সেই আগের মত এখনি ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।”

“না না, অসময়ে ঘুমুলে শরীরটা আরও ভার হ'তে পারে।”

“তবে থাক্, ঘুমিয়ে কাজ নেই, শুয়ে শুয়ে গল্প কর।”

পশ্চিমদিকের মুক্ত বাতায়ন হইতে শরৎ-অপরাহ্নের দীপ্ত সোনালী রবিকিরণ এক ঝলক আসিয়া বিপরীত দিকের ভিত্তি সংলগ্ন মণিকার পরলোকগতা জননীর বৃহৎ তৈলচিত্রখানির উপর পড়িয়াছিল। সেই নির্ম্মল স্বর্ণকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া সেই স্বর্গলোকবাসিনীর স্বভাবসুন্দর কমনীয় মূর্ত্তিখানি যেন একখানি সজীব দেবীপ্রতিমার মত প্রতীয়মান হইতেছিল।

সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মণিকা বলিল, “হ্যাঁ বাবা, মা'র ছবিখানা তোলা হয়েছে কদ্দিন?”

“সে অনেক দিন মা, তোমার জন্মের প্রায় মাস ছয়েক আগে তোলা হয়েছিল।”

“মা কি সুন্দর দেখ্‌তে ছিলেন! আমার কিন্তু একটুও মাকে মনে পড়ে না বাবা!”

যোগেশ্বর বাবু একটী গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মমতার্দ্র-কণ্ঠে কহিলেন, “কি করে মনে পড়বে মা? তুমি যে তখন নেহাত কচি, ভাল করে কথা কইতেও শেখনি।”

মায়ের প্রসঙ্গ পিতার যে কতখানি প্রিয় ছিল, মণি তাহা জানিত, তা'ই সেই প্রসঙ্গ পুনরায় তুলিয়া বলিল, “আচ্ছা বাবা, পিসীমা বলেন, মা'র চেহারা নাকি ঠিক আমার মত দেখতে ছিল, কিন্তু ফটো দেখে তো মনে হয়, মা আমাব চেয়ে ঢের—ঢের সুন্দর ছিলেন।”

কন্যার কথায় একটু হাসিয়া যোগেশ্বর প্রীতি-স্নিগ্ধ-মুখে বলিলেন, "না মণি, সে তোমার চেয়ে শরীরে একটু দোহারা ছিল, তা ছাড়া মুখ চোখ, আকৃতি প্রকৃতি সমস্তই তোমার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। ভাল কথা, হ্যাঁ মা, সুধীরকে নিতে মোটর গিয়েছে তো?"

"অনেকক্ষণ গিয়েছে বাবা।"

"তা'হলে তুমি দেখগে যাও, সে এল বলে।"

মণিকা লজ্জিত হইয়া বলিল, "একটুখানি বসি না বাবা, পিসীমা জল টল খাবার দেবেন অখন।"

"তবে বসো।"

উন্মনা যোগেশ্বর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া সম্মুখে বিলম্বিত স্বর্গগতা পত্নীর রৌদ্রভাসিত উজ্জ্বল চিত্রখানির দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে বলিলেন, "আর কতদিন—ওগো দেবী!—ওগো ত্রিদিববাসিনী ভাগ্যবতী! মরতের এ দুঃখ-ব্যথাগ্রস্ত অভাজনকে আর কতদিন ভুলিয়া থাকিবে? তোমার বুকের নিধি বুকে বুকে আগুলিয়া, তোমার পবিত্র ব্যথাভরা স্মৃতির আরাধনায় এই দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ একটী যুগ কাটিয়া গেল, এখন জীবনের সব কাজ সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বসিয়া আছি, তোমার প্রেমময় মধুর আহ্বানের প্রতীক্ষায়। সেই সুদূরের আহ্বান আর কতদিনে আসিবে দেবী? এই মিলন—আশাহীন, দুর্ব্বল, শূন্য জীবনভার বহন করিয়া আর যে বাঁচিয়া থাকিতে পারি না!

যোগেশ্বর বাবুর সজল চক্ষু দুটী শ্রান্তিভরে মুদিয়া আসিল। পিতার সেই তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে মণিকা সেই একই ভাবে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মোটরের শব্দে সুধীরের আগমনবার্ত্তা পাইয়াও সে উঠিল না।

মেয়ের বাপ।

কলেজ প্রত্যাগত সুধীর নিত্যকার মত চঞ্চল ক্ষিপ্রগতিতে নিজের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিল, সেখানে আজ আর সেই দুটী প্রতীক্ষমান ব্যগ্র ব্যাকুল চক্ষু তাহার আশাপথ চাহিয়া নাই। দেখিয়া সুধীর একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল। তাহার উৎসাহভরা প্রফুল্ল মনখানি এই সামান্য ঘটনাতেই যেন মুস্‌ড়াইয়া গেল।

কলেজের কাপড় ছাড়িয়া সে একখানা ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ভাবে পড়িয়া রহিল, কতক্ষণ গেল, তখনও মণিকার দেখা নাই। একটু বিরক্ত হইয়া সুধীর আত্মগত ভাবেই বলিয়া উঠিল, "আজ এদের হ'ল কি?"

মণির মায়ের আমলের পুরাতন ঝি নিস্তারিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মুখ হাত ধোয়া হয়েছে বাবা? খাবার নিয়ে আসব?"

সুধীর অনাগ্রহের সহিত বলিল, "না, এই যে যাই।"

"যাও, আমি খাবার নিয়ে এলুম বলে।"

সুধীর গমনপরা নিস্তারিনীকে ডাকিয়া বলিল, "পিসীমা কোথায় গিন্নিঝি?"

নিস্তারিণীকে বাড়ীর সকলেই গিন্নিঝি বলিয়া ডাকিত। গিন্নিঝি যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল, "তিনি রান্না ঘরে, এ বেলা কি রান্না হবে, ঠাকুরকে তা'ই বুঝিয়ে দিচ্ছেন।"

"আর তোমাদের দিদিমণি?"

"দিদিমণি বোধ করি কর্ত্তার ঘরে, ডেকে দেব?"

"কর্ত্তা কি বাড়ীতেই আছেন না কি?"

"হ্যাঁ, তিনি তো আজ বেরোণ নি। যাই আমি জল খাবার নিয়ে আসি।"

"না থাক্, শুধু এক পেয়ালা চা নিয়ে এস গিন্নিঝি, আর কিছু দরকার নেই।"

"শুধু চা? আচ্ছা তাই আনছি, আর দিদিমণিকেও ডেকে—"

বাধা দিয়া সুধীর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না থাক্, এখনি ডাক্‌তে হবে না।"

সুধীরের তিক্ত কণ্ঠস্বরে যেন অভিমান উথলিয়া পড়িতেছিল। তাহাদের কলেজে কাল একটা কিসের ছুটী ছিল, তা'ই বন্ধু বিনয়ের সহিত পরামর্শ আঁটিয়া সুধীর হৃষ্ট অন্তরে পরমোৎসাহে আসিয়াছিল, তাহার প্রিয়তমা মণিকাকে আজ মনোমত সাজে সাজাইয়া একটু বেলা থাকিতে অনেক দূরে বেড়াইতে লইয়া যাইবে এবং ফিরিবার পথে অমনি বায়স্কোপের নূতন ফিল্‌ম্‌টা দেখাইয়া আনিবে।

কিন্তু প্রিয়ার এতক্ষণ অনুপস্থিতি তাহার সমস্ত প্ল্যান্ ও উৎসাহ মাটি করিয়া দিল। জামাই বাবুর উদাস গম্ভীর মুখের পানে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গিন্নিঝি নীরবে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বুড়ী মনে মনে হাসিয়া বলিল, "মা গো মা! একালের ছেলে মেয়ে গুলোর 'খুরে' নমস্কার! একটুখানি চক্ষের আড়াল হয়েছে কি, একেবারে মুখ অন্ধকার! এতটুকু যদি কাণ্ড জ্ঞান থাকে এদের,— আরে বাপু, বাপের কাছে মেয়ে একদণ্ড বস্‌বে না, একটু সেবা আত্তি করবে না, সে কি কথা? আর বাপ বলে বাপ? ঐ মেয়েটুকুকে বুকে করে ব্রাহ্মণ এত বড় যৈবন বেরথায় কাটিয়ে দিলে? অমন বাপকে হেনস্তা করা ধর্ম্মে সইবে কেন গা।"

গিন্নিঝি দৃষ্টির অন্তরাল হইতেই, সুধীর উঠিয়া পড়িল, যেখানে

প্রাণের এতখানি ব্যাকুলতা ও আগ্রহ, সেখানে মান অভিমান কতক্ষণ টি঳কিতে পারে? শ্বশুরের শয়ন কক্ষের দিকে পা টিপিয়া নিঃশব্দে গিয়া সুধীর ভেজান দরজার সার্সির ভিতর হইতে দেখিতে পাইল, নিদ্রিত পিতার শিয়রে বসিয়া মণিকা তাঁহার স্বেদাক্ত ললাটে আঁচল দিয়া, আস্তে আস্তে বাতাস দিতেছে। উভয়ের চোখে চোখ মিলিতেই সুধীর হাতখানি দিয়া মণিকে ডাকিল। কিন্তু তথাপি মণি উঠিল না, সে হাতের ইসারায় সুধীরকে একটু সবুর করিতে বলিল।

সুধীর বিমর্ষমুখে ধীরে ধীরে সকলের অসাক্ষাতে বাথরুমে আসিয়া, হাত মুখ ধুইয়া নিজের ঘরে গিয়া দেখিল, গিন্নিঝি শুধু চা নয়, এক ডিস্ ফল ও খাবার রাখিয়া গিয়াছে।

সুধীর চায়ের পেয়ালা এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া, খাবারের ডিস্‌খানা অবজ্ঞার সহিত এক পাশে ঠেলিয়া দিল। তাহার পর একখানা বই হাতে লইয়া সে গুম্ হইয়া ভাবিতে লাগিল—হায়! এই কি তাহার সুখের জীবন! স্বর্ণপিঞ্জরাবদ্ধ, সুপেয় সুখাদ্য ভোজী বন বিহঙ্গের মত, ধনৈশ্বর্য্যের বিপুল আড়ম্বর ও রাজ সুখ ভোগে বেষ্টিত স্বাধীনতা বর্জ্জিত এই যে তাহার তুচ্ছ জীবন, ইহা অন্যের পক্ষে লোভনীয় ও ঈপ্সিত হইলেও সুধীর যে এ কামনা কোনও দিন মনে মনেও করে নাই! সে যে চিরদিনই স্বাধীনতা প্রিয়।

জীবনে কোনও দুঃখ বা অভাব না থাকিলেও, সুখের পিয়াসী মানব জোর করিয়া দুঃখ অভাব খুঁজিয়া বাহির করে, ইহা তাহাদের স্বভাব ধর্ম্ম। তাহাই ঐহিক সুখের সমস্ত উপাদান না চাহিতে পাইয়াও সুধীর আশানুরূপ সুখী ও তৃপ্ত হইতে পারিতেছিল না। ভাল করিয়া

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সুধীর স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল, তাহার জীবনের কোথায় কি একটা প্রকাণ্ড গলদ ঘটিয়াছে, কিন্তু সেই গুরুতর ভুলের সংশোধন করিবার কি আর উপায় নাই? এ ইচ্ছাকৃত পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

মণিকা ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। বলিল, "আমাকে ডাক্‌ছিলে কি?"

সুধীর মুখ না তুলিয়াই গম্ভীর ভাবে কহিল, "হুঁ।"

স্বামীর এই নির্লিপ্ত অনাগ্রহভাবে কিছু বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া মণিকা বলিল, "কেন ডাক্‌ছিলে?"

"ঘাট হয়েছে, মাপ করো আমায়।"

অভিমান করিবার কারণ আজ যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তথাপি মণিকা একটুও সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। পিতার অসুস্থতার জন্য তাহার মনটাও আজ ভাল ছিল না। সে বেশ সহজ ভাবেই তাহার এতক্ষণকার অনুপস্থিতির কারণ দর্শাইয়া বলিল, "আজ বাবার শরীরটা বেশ ভাল নেই, তাই—"

"কেন? জ্বরটর হয়েছে নাকি?"

"না, জ্বর তো স্পষ্ট বোধ হ'ল না, তবে গা টা কেমন ম্যাজমেজে হয়ে রয়েছে।"

"ও!" বলিয়া সুধীর খানিক নীরব হইয়া থাকিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তা'হলে তুমি বাবার কাছেই যাও, উঠে এলে কেন?"

মণি বলিতে যাইতেছিল, "তুমি ডাক্‌লে কেন?" কিন্তু তাহা না বলিয়া সে উপেক্ষিত অভুক্ত খাবারগুলির দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,

"নাঃ, এমন কিছু অসুখ নয় তো? সেখানে পিসীমা রয়েছেন। কই তুমি খাবার টাবার খাওনি এখনো?—এসেছ তো অনেকক্ষণ।"

"না, খাবার আজ খাব না, শুধু চা খেয়েছি।"

"কেন?"

"ক্ষিদে নেই।"

স্বামীর অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া মণিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা মিথ্যে কথা বল্‌তে শিখেছ যা'হোক্! ক্ষিদে আছে না আছে, তা যে তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে,—না বল্লেই তো হয় না।"

মণিকা একখানি গোটা সন্দেশ জোর করিয়া স্বামীর মুখে গুঁজিয়া দিয়া সহাস্যে কহিল, "সত্যি বাপু! এত অল্পেই তোমার রাগ হয়ে যায়, আশ্চর্য্য!"

সুধীর বিনাপত্তিতে সন্দেশ চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "আশ্চর্য্য আবার কি? কখন থেকে পথ চেয়ে বসে আছি, তবু আসাই হয় না মশাইয়ের!"

সুবোধ বালকের মত সুধীর অবিলম্বে সমস্ত খাবারগুলি উদরস্থ করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া মণিকা কৌতুকভরা হাসির সুরে বলিল, "এই বুঝি তোমার ক্ষিদে পায়নি? খাবারগুলো সব গেল কা'র পেটে বল তো?"

জঠরানল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের গরম মেজাজও ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছিল। "সে মণিকাকে কাছে বসাইয়া আদরমাখা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, কিছু মনে করোনা মণি!" কাল আমাদের কলেজের ছুটী, তা'ই

ভেবেছিলুম আজ সকাল সকাল তোমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুব, তারপর বায়োস্কোপে একটা ভাল ফিলিম্ দিয়েছে সেটাও দেখে আস্‌ব—বিনয়ও যাবে বলছিল,—"যাক্ বেড়ানো নাইবা হ'ল বায়োস্কোপে যাবার এখনো ঢের সময় আছে, এই বেলা তুমি চুলটুল বেঁধে ত'য়ের হয়ে নাও মণি! আর দেখ—" আদরে মণিকার চিবুক স্পর্শ করিয়া সুধীর সানুরাগে বলিল, "আজ সেই নতুন আস্‌মানি রংয়ের বেনারসী সাড়ীখানা পরতে হবে কিন্তু, সেটাতে তোমায় বাস্তবিক বড় সুন্দর মানায় মণি! আমার মণি মাণিককে কিসেই বা অসুন্দর দেখায়? এই যে শুধু একখানি কালাপেড়ে সাড়ী আর সাদা সেমিজ গায়ে দিয়ে চুল এলিয়ে বেড়াচ্ছ, এতেই বা কি চমৎকার দেখাচ্ছে!"

সৌন্দর্য্যমুগ্ধ স্বামীর এই আদর ও প্রশংসায় লজ্জায় সুখাবেশে আরক্ত হইয়া মণিকা বলিল, "যাও! ফের মিছে কথা বলছ?"

বিমুগ্ধ অতৃপ্ত দৃষ্টিতে সুন্দরী তরুণী পত্নীর দিকে চাহিয়া সুধীর একটী ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া গাঢ়কণ্ঠে বলিল, "মিছে কথা নয় মণি! তোমার ঐ লক্ষ্মীর মত রূপ দেখেই তো আমি ভুলে গিয়েছিলুম, নইলে শুধু ঐশ্বর্য্যের লোভে—নাঃ, আমার এ কথা এখন কেই বা বিশ্বাস করবে? যাও মণি, কাপড় চোপড় ছেড়ে এস্‌গে, সাড়ে আটটায় আরম্ভ, একটু এগিয়ে গেলেও ভাল হয়।"

মণিকা কিন্তু উঠিল না, সে কুণ্ঠানত মুখে একটু সঙ্কোচের ভাবে বলিল, "কিন্তু আজ তো আমি যেতে পারব না, কি জানি রাত্তিরে বাবা কেমন থাকেন, তা'র চেয়ে তুমি একাই গিয়ে দেখে এস, আমাকে এর পর একদিন নিয়ে গেলেই হবে।"

"কেন এইতো বল্লে এমন কিছু অসুখ নয়, আর পিসীমা রয়েছেন যখন—"

"তিনি বুড়ো মানুষ, রাত জাগতে পারবেন কেন?"

"তা'ছাড়া আরও তো ঢের লোক আছে, এত চাকর বাকর—"

বাধা দিয়া মণিকা অস্বাভাবিক দীপ্তকণ্ঠে কহিল, "কি বল তুমি? চাকর বাকরের হাতে বাবার সেবার ভার দিয়ে, আমি যাব তামাসা দেখ্‌তে! তবে আর ছেলে মেয়ে লোকে কামনা করে কেন?"

সুধীরকে স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, অনুতপ্তা মণিকা তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মিনতি করুণ সুরে বলিল, "রাগ করলে? কিন্তু তুমি অন্যায় বুঝো না। আমি ছাড়া বাবার আর কে আছে বল? আমি না দেখ্‌লে তাঁ'কে আর কে দেখবে?"

আশাভঙ্গে মনঃক্ষুণ্ণ সুধীরের ইচ্ছা হইল যে স্পষ্ট কথায় বলে তাহাকেই বা দেখিবার লোক এখানে আর আছে কে? কিন্তু উদ্যত রসনা সংযত করিয়া লইয়া সে ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তা'হলে থাক্‌, আজ আমারো গিয়ে কাজ নেই, দুজনেই বাবার কাছে থাক্‌ব।"

মণিকা কিছু লজ্জিত ও প্রীত হইয়া বলিল, "না না, অতটা কর্‌বার্‌ দরকার নেই, বাবা বোধ হয় রাত্তিরে ভালই থাক্‌বেন। কিন্তু তোমাকে যে যেতেই হবে, নইলে বিনয় বাবু কি মনে করবেন? যাবে তো?"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু—"

স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চাহিয়া মণিকা সাগ্রহে বলিল, "কিন্তু কি? বল্‌তে বল্‌তে সাম্‌লে যে?"

সে কথার উত্তর না দিয়া সুধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "মণি ?"

"কি গা ? কি বলছিলে তাই বল না ?"

মণিকার একখানি হাত কোলের উপর টানিয়া লইয়া সুধীর অপ্রকৃতিস্থ গাঢ়স্বরে বলিতে লাগিল, "এম্নি করে থাকা তোমার কি খুব ভাল লাগে মণি ? এই রকম আট ঘাট বাঁধনের মধ্যে থেকে একঘেয়ে একটানা জীবনযাপন করা, এটা কি বড় সুখের,—বড় গৌরবের মনে কর ? কিন্তু তুমি মনে করলেও আমি যে তা কিছুতেই পারছি না মণি, আমার যে দিনের দিন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে !"

স্বামীর এই অকারণ বেদনা ও উচ্ছ্বাসের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, মণিকা বিস্ময়ে ও সংশয়ে আকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া ম্রিয়মান সুধীরকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টায় সে হাসিতে হাসিতে রহস্যচ্ছলে বলিল, "বুঝেছি, এরি মধ্যে বুঝি অরুচি জন্মে গেল ? তা'হলে দিনকতকের জন্যে ঠাকুরঝির কাছে গিয়ে না হয় মুখ বদ্‌লে এসগে— আমার তো অরুচি ধরবার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না,—এ ভাবে থেকে জন্ম জন্মান্তরেও বোধ হয় আমার—" বলিতে বলিতে মণিকা সলজ্জ মুখে স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

প্রেয়সীর সলজ্জ সুন্দর মুখখানি বক্ষে রাখিয়া সুধীরের মনের সমস্ত বেদনা ও ক্ষোভ নিঃশেষে মুছিয়া গেল। সে মণিকাকে আদর করিয়া প্রেম কোমল কণ্ঠে কহিল, "সত্যি অরুচি হবে না, হ্যাঁ মণি ?"

"না গো না, কোন জন্মেও নয় ! তবে তুমি যদি না চাও—"

"না চেয়ে কি করি মাণিক আমার ! তোমাকে ছেড়ে একতিল থাক্‌তে পারি না বলেই তো আমার গত কাল হয়েছে ! সত্যি তুমি যে

আমায় কি করেছ মণি,—তুমি যে আমার কি তা বুঝতে পারি না। ইচ্ছে করে তোমাকে নিয়ে এমন কোথাও চলে যাই, যেথানে জগতের আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না, শুধু তুমি আর আমি। যেথানে কোনও বাধা কোনও বিঘ্ন আমাদের দুটী প্রাণকে এক নিমেষের জন্যেও অন্তর করতে পারে না; দুজনে দুজনকে ভালবেসে পরস্পরের প্রেমে বিভোর হয়ে আর সব ভুলে যাই, অভাব অভিযোগ কিছুই থাকে না। কিন্তু আমার মনের ভাব তুমি বুঝবে না মণি, তুমি এখনো নেহাত ছেলে মানুষ।"

সুধীরের সেই আকুল প্রাণের আবেগোচ্ছ্বসিত বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলেও স্বামীর গভীর প্রেমের পরিচয় পাইয়া মণিকা সুখে পুলকাবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িল।

যথাসময়ে সুধীরকে বায়স্কোপে পাঠাইয়া দিয়া মণিকা পিতার ঘরেই আড্ডা গাড়িল। এ বেলা যোগেশ্বর বাবু বেশ সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ গল্প সল্প করিয়া মণিকা পিতার অনুরোধে যখন শয়ন করিতে গেল, তখন রাত্রি বেশ গভীর হইয়াছে। মহামায়া তখনও শয়ন করেন নাই, কপাটে পিঠ দিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে মালা জপ করিতেছিলেন, মণিকার পদশব্দে চমকিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বাবা এখন কেমন আছে রে মণি? দুধটুকু খেয়েছে?"

"বাবা ভাল আছেন, দুধ খাইয়ে দিয়েছি, তুমি এখনো শোওনি পিসীমা? রাত যে ঢের হয়েছে।"

"এই যে শুই মা,—কি করি বল্, সংসারের নানান ঝঞ্ঝাটে দিনের বেলা এমন তো সময় পাই না, যে দুদণ্ড নিশ্চিন্দি হয়ে ভগবানের নাম

করব। একেই বলে কর্ম্মভোগ! ঘর সংসার সব ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় এসেছিলুম বাবা বিশ্বনাথের চরণে মুক্তিলাভের আশা করে, তা সব গুলিয়ে গেল, বুড়ো বয়সে আবার নতুন করে সংসারের মায়ায় বদ্ধ করে আমায়, তোর মা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। কপালের ভোগান্তিক যাবে কোথায় মা? হ্যাঁ রে সুধীর এখনো খেলো না? শুয়েছে নাকি? পড়বার ঘর তো অন্ধকার!"

"না, বায়স্কোপ দেখতে গেছেন যে—"

"বায়স্কোপ দেখ্‌তে গেল? ও মা, তা খেয়ে গেলেই তো ভাল হ'ত? সে যে অনেক রাত্রিরে ফিরবে, ততক্ষণ খাবার আগ্‌লে বসে থাকে কে? বামুন চাকরগুলো তো মানুষ! অষ্টপ্রহর খাটছে, আবার রাত্রির বেলাও—"

আজ কি জানি কেন একটা অকারণ বেদনা ও অভিমানে মণিকার তরুণ হৃদয়খানি ভরিয়া উঠিয়াছিল, পিসীমার কথায় সে আহত হইয়া প্রদীপ্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "আগ্‌লে বসে থাকবার দরকার কি? ঠাকুরকে বলে দাও না, খাবারগুলো আমার ঘরেই চাপা দিয়ে রেখে যাক্‌, যখন আসবে তখন খাবে—"

"ওমা সে কি কথা! খাবারগুলো জুড়িয়ে গেলে, সে খেতে পারবে কেন?"

"কেন পারবে না? খুব পারবে! যা'র যেমন দশা সে তেমনি থাক্‌বে, এতে আর হয়েছে কি?" বলিতে বলিতে অস্বাভাবিক দ্রুত পদক্ষেপে নিজের ঘরে ঢুকিয়া ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

বেচারি পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই অদ্ভুত আচরণে বিস্ময়ে হতভঙ্গ হইয়া ভগবানের নাম করাও ভুলিয়া গেলেন !

কয়েকটী কারণে মণিকার মনখানি আজ প্রকৃতিস্থ ছিল না। এক তো পিতার অসুস্থতা, তাহার পর স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ অনিচ্ছায় করিয়া একটা অস্বস্তি ও বেদনা মণির কোমল অন্তরখানিতে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতেছিল। বাবা এখন তো বেশ ভালই আছেন, তবে তাহার সঙ্গে গেলেই বা কি ক্ষতি ছিল ? সে যায় নাই, তাই বুঝি দুঃখ ও অভিমানের ঝোঁকে স্বামী অমন সব কথা বলিয়াছিলেন, যাহা শুনিলে চক্ষের জল রাখা ভার হইয়া উঠে ? আচ্ছা ওগুলি কি সবই ভালবাসার কথা না আরও কিছু ? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মণিকা আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

এগারো।

"মণি! মনু,—মাণিক আমার! আমার চোখের মণি,—মাথার মণি!—আমার সাতরাজার ধন একটী—"

"আঃ! হল কি তোমার বাপু? আজ আবার এত আদরের ঘটা পড়ল কেন?"

"কেন? আদর কি আমি কোনও দিন করি না নাকি? ভারি তো বেইমান তুমি!"

"কিন্তু তোমার ঐ সাপের মন্তর—"

"সাপের মন্তর? না আমার মণিমালার আদরের মন্তর—"

"তা ওই সৃষ্টিছাড়া আদরের মন্তরগুলো একটু চুপি চুপি আওড়ালেই ভাল হয় না? কে কোথা থেকে শুনে নেবে—"

"শোনবার লোক আর এখানে কে আছে?"

"কেন পিসীমা, আর চাকর বাকরগুলো—"

সুধীর কৌতুকভরা মধুর চাহনীতে স্ত্রীর পানে চাহিয়া দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "ওঃ! শুনলেই বা ওঁরা? আমাদের সম্পর্কটা যে শুধু গুরুশিষ্যার নয়, তা'তো সকলেই জানে!"

মণিকা লজ্জায় মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, "যাও, তোমার সকল তাতেই ঠাট্টা! এখন ঠাট্টা রেখে আসল মতলবটা কি বল দেখি? আজ যে ভারি ফুর্ত্তি দেখছি, যেন--"

"যেন রাহুমুক্ত শশধর, নয়?"

"আবার ঠাট্টা? তবে আমি চল্লুম পিসীমার কাছে সুক্তুনি রান্না শিখতে—"

"ইঃ আজকাল যে রান্নায় অখণ্ড মনোযোগ দেখছি! এবার একেবারে 'বিবি পাণ্ডব' না হয়ে, আর ছাড়ছ না বোধ হয়!"

মণিকা রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সুধীর দুই হাতে তাহার গতিরোধ করিয়া বলিল, "বেশ তো, যাও না চলে, তা'হলে চিঠিখানা আর দেখাব না।" সুধীর পকেট হইতে একখানা খোলা চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

"কা'র চিঠি গো! দেখি দেখি—"

মণিকা উৎসুক হইয়া চিঠি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। সুধীর রঙ্গ করিয়া চিঠিখানি আরও উঁচু করিয়া ধরিল। মণিকা অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াও যখন সুধীরের সহিত পারিয়া উঠিল না, তখন শ্রান্ত হইয়া বলিল, "বাপ্‌রে বাপ! মানুষকে তুমি এমনও জ্বালাতন করতে পারো— থাক্ চাই না আমি চিঠি পড়তে—"

"হার মান্‌তে হল কি না?—এই নাও চিঠি, সুধীর পত্রখানি মণিকার কোলের উপর ফেলিয়া দিল।

মণিকা তাড়াতাড়ি চিঠির উপর চোখ বুলাইয়াই সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরঝির বিয়ে পাঁচই বৈশাখ—ওমা তা'হলে আর দিন কই? কার সঙ্গে হচ্ছে—" বিনয় কৃষ্ণ গুঙ্গোপাধ্যায়—হ্যাঁ গা, একি আমাদের বিনয়বাবু নাকি?

সুধীর হাসিতে হাসিতে সকৌতুকে বলিল, "কোন্ বিনয় তা গেলেই দেখ তে পাবে।"

"নিশ্চয় এই বিনয় বাবু,—কিন্তু ঘট্‌কালিটা করলে কে, তুমিই বুঝি ?—

"হ্যাঁ, বিনয়কে অনেক কষ্টে রাজি করেছি মণি, কিছুতেই মত হয় না তা'র—"

"কেন অমত করবার কারণ? আমাদের ঠাকুঝির রংটা একটু ময়লা তা ছাড়া আর কোনও খুঁত নেই। আমি তো সেই ছোটটী দেখেছি, তখনই মুখ চোখ গড়ন পিঠন কেমন খাসা ছিল, এখন তো আরও কত সুন্দর হয়ে থাক্‌বে। আর তোমাদের বিনয় বাবুই বা কোন্ নদের কার্ত্তিকটী!"

"সেজন্যে নয় মণি, বিনয় নদের কার্ত্তিক হলেও আমার কথা তা'কে রাখতেই হ'ত, সে কি আমার যেমন তেমন বন্ধু ?"

সুধীরের বন্ধুত্ব গর্ব্বে স্ফীত প্রফুল্ল মুখের পানে চাহিয়া মণিকা সহাস্যে বলিল, "সে আমি জানি, কিন্তু তবে তোমার বন্ধুবর আপত্তি করছিলেন কেন শুনি ?"

"বিনয় কি বলে জানো? পুরুষ মাত্রেরই নিজে উপার্জ্জনক্ষম না হ'লে বিয়ে করা উচিত নয়। সে এবার বি, এস, সি পাশ করে লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল কলেজে যাবে কি না?"

একটী মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া মণিকা বলিল, "তা কথাটা বড় মিথ্যে নয়, স্বামীর রোজগার মেয়েদের যতখানি আনন্দ দিতে পারে এমন আর"—বলিতে বলিতে সে হঠাৎ থামিয়া গেল। কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "কিন্তু বিনয় বাবুর এ কথা বলা অন্যায়, আমি তো শুনেছি তাঁ'র বাড়ীর অবস্থা খুব ভাল, বাপ্ বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করেন, তবে—"

বাধা দিয়া সুধীর ক্ষুব্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, "আর কথা দিয়ে কথা ঢাক্‌তে হবে না মণি! তোমার মনের কথা আজ ধরা পড়ে গেছে!"

মণিকা অপ্রতিভ হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "মনের কথা কি আবার—তুমি কেবলই উল্টো বুঝবে!"

"উল্টো নয়, এতো খুব সোজা—আর সত্যি কথা মণি! যে নিজে উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে থাওয়া করে, সে যে মূর্খ, মহামূর্খ তাতে কোনও ভুল ভ্রান্তি নেই!

কিন্তু কথাটা সময় থাক্‌তে বুঝিনি, এই বড় আক্ষেপের বিষয়।"

অতর্কিতে স্বামীকে ব্যাথা দিয়া মণিকা নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মনে মনে শত ধিক্কার দিল, লজ্জায় দুঃখে মরমে মরিয়া গিয়া সে সজল কণ্ঠে বলিল, "তোমার ঐ এক কথা আমি কি তাই বলেছি?"

"যদি বলেই থাক, তা'তে কোনও অন্যায় তো হয়নি মণি, আমার মত অপদার্থ স্বামীকে তুমি একশো বার এ কথা বল্‌তে পারো!"

"ছি ছি! তুমি কি আমাকে এমনই হীন মনে কর? তোমার উপার্জ্জনের অভাবে আমায় কোন্ অসুবিধেটা ভুগতে হচ্ছে যে এমন সব চিন্তা মনে আসতে পারে? এ তোমার ভারি অন্যায় কিন্তু—" "বলিতে বলিতে লজ্জা ও অভিমানের গোপন ব্যাথায় মণিকার জলে ভাসা নীল পদ্মের মত চল্‌চলে আয়ত নয়ন দুটীতে অশ্রুজল উচ্ছল হইয়া উঠিল।" সে চক্ষের জল দেখিয়া সুধীর আর সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল। পরম আদরে অনুরাগে প্রিয়তমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া প্রেমাবেগে কহিল, "আমাকে মাপ করো মণি, তুমি যে কি রত্ন তা ভাল

করে জেনে শুনেও, কি জানি কেন তোমাকে কেবলি ব্যাথা দিয়ে ফেলি, আমার এ স্বভাবের দোষ না মরলে যাবে না বুঝি !"

স্বামীর সেই প্রাণস্পর্শী বাক্যে ও আদরে মণিকার অশ্রুসজল মুখখানিতে মেঘ ভাঙ্গা চাঁদের মত মৃদু চকিত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে সোহাগ মাখা মিষ্ট সুরে বলিল, "বল, এ রকম কথা তুমি আর কক্ষণো বলবে না ?"

না গো না, কক্ষণো বলবো না, আর যদি বলি তা'হলে গুরু মহাশয়ের মত তুমি আমার কাণ ধরে একশো বার উঠ বস করিও, কেমন ?"

মণিকা কৌতুকভরে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "মাগো তোমার মতন খাম্‌খেয়ালী মানুষ যদি আর দুটী থাকে ! যাক, এখন ওসব কথা রেখে কাজের কথা বল, আচ্ছা বিয়ে হয়ে ঠাকুরঝি কাশীতে আসবে নাকি ?"

"না, তা কি করে আসবে ? বিয়ের পর বিনয়ের বাপ মা যেখানে, আছেন সোজা সেইখানেই তো নিয়ে যাবে।"

অতি মাত্র ক্ষুণ্ণ হইয়া মণিকা বলিল, "কিন্তু একবারটী এখানে এলে বড় মজা হ'ত, দুজনকে নিয়ে মনের সাধে আমোদ করতুম। বিনয়বাবু যেমন, যখন তখন আমাকে ঠাট্টা করেন, তা'র শোধ তুলতুম।"

"শোধ তুলো পরে, এখন উপস্থিত আমার যাওয়ার ব্যবস্থা যে করতে হবে, সময় তো আর বেশী নেই, অন্ততঃ বিয়ের আগের দিন না পৌঁছিলে মামাবাবু, মাসীমা কি মনে করবেন ? আর রাণী, সে যে ভারি দুঃখ পাবে—"

মণিকার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, শুষ্ক ম্লান মুখে সে বলিল, "হ্যাঁ তাতো সত্যি, তোমাকে সেখানে যেতে হবে নিশ্চয়, কিন্তু আমি বুঝি ঠাকুরঝির বিয়ে দেখ্‌তে পাব না? আমাকে নিয়ে যাবে না তুমি?"

সুধীরের চক্ষু দুটী আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই বিমর্ষ হইয়া সে বলিল, "কি করে নিয়ে যাব মণি? তোমাকে বাবাতো পাঠাবেন না। নইলে মামাবাবু কত আগ্রহ করে তোমাকে নিয়ে যেতে লিখেছেন, চিঠিতে পড়লে তো?"

মণিকা মাথা নাড়িয়া আবদারের সুরে বলিল, "কিন্তু আমি তো না গিয়ে ছাড়ব না, বারে! ঠাকুরঝির বিয়ে তুমি একা একা দেখ্‌বে বুঝি? সে হবে না!"

সুধীর মণিকাকে আদর করিয়া সস্নেহ সান্ত্বনায় বলিল, "না মণি লক্ষীটী! বাবা তোমাকে পাঠাতে কখনই রাজি হবেন না, আমি জানি,— তা'ছাড়া সেখানে তোমার বাস্তবিক বড় কষ্ট হবে, যার যে ভাবে থাকা অভ্যাস—"

"না না, অভ্যেস টভ্যেস ওসব মিছে কথা, আমাকে না নিয়ে যাবার ফন্দী আর কি! আমার সেখানে কিছু কষ্ট হবে না, দেখো, যাই পিসীমাকে এড়ে বেড়ে ধরিগে, তিনি বল্লে বাবা আমাকে পাঠাতে আপত্তি করতে পারবেন না।

'কষ্ট হবে না' কথাটা মণিকা বড় গর্ব্ব করিয়া মুখে বলিল বটে, কিন্তু তাহার স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠিল, দুটী দিনের দেখা, স্বল্প পরিচিত শ্বশুর গৃহের সেই দৈন্য লাঞ্ছিত ম্লান ছবি। কিন্তু সে যে অনেক দিনের কথা,

মণিকা তখন ছেলেমানুষ ও অবুঝ ছিল, এখন তাহার বুঝিবার ও সহিবার বয়স হইয়াছে, স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া অল্প কয়েকদিনের জন্য সামান্য কষ্ট বা অসুবিধা ভোগ করা, এটুকুও কি সে সহ্য করিতে পারিবে না ; তবে ছার নারী জন্ম লইয়া সে পৃথিবীতে আসিয়াছে কিসের জন্য ?

মণিকার চিন্তিত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুধীর বলিল, "বাবার মত নিয়ে যদি দুটী দিনের জন্যেও যেতে পারো মণি, তা'হলে তা'র বেশী আর আনন্দের বিষয় আর কি আছে ? সত্যি মণি, তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে, এত বড় একটা খুসীর খবর পেয়েও আমার মনটা যেন কেমন কেমন করছে,—কিন্তু বাবা কি রাজি হবেন্ ?"

"হবেন গো হবেন, দাও দেখি মামাবাবুর চিঠিখানা—"

"বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র বাবার কাছেও এসেছে যে—"

"কিন্তু বাবা আমাকে চিঠির কথা বলেননি তো, তোমার খানাই একবার দাও না বাপু, পিসীমাকে দেখিয়ে আনি—"

পুষ্পরাণীর শুভবিবাহের আমন্ত্রণ পত্রখানি লইয়া মণিকা পিসীমার কাছে ছুটিয়া গেল। পিসীমা তখন গৃহদেবতা নারায়ণের নিত্য সেবার ভোগ রন্ধন সমাপ্ত করিয়া, পাকশালার দালানে বসিয়া, বিশ্রাম করিতেছিলেন। মণিকা অশান্ত বালিকার মত তাঁহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডাকিল, "পিসীমা !"

"কেন রে মণি। আজ আবার কি দরকার হ'ল ?"

কোনও প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস চাহিতে হইলেই, মণি এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে পিসীমার কাছে আদায় করিত। ইহা তাহার চিরদিনের অভ্যাস।

মেয়ের বাপ।

"না পিসীমা, আজ আর কিছু দরকার নেই, এই চিঠিখানা দেখেছ আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে!" মণিকা, তাহার মামা শ্বশুরের লেখা চিঠিখানি পিসীমার হাতে দিল। রামায়ণ মহাভারত অবাধে পড়িয়া গেলেও লেখা কিম্বা হাতের লেখা পড়া মহামায়ার কখনও অভ্যাস ছিল না। তাই চিঠিখানা নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি বলিলেন, "কে লিখেছে চিঠি, বেয়াই নাকি? কি লিখেছেন পড় তো।" মণিকা রঙ্গ করিয়া বলিল, "তুমিই পড় না পিসীমা? বারে! বই পড়তে পারো আর চিঠি পড়তে পারো না! এ যে বড় আশ্চর্য্য!"

"হক্ আশ্চর্য্য, নে তুই পড়বি তো পড় চিঠিখানা, নইলে আমি উঠি বাপু?"

"না না, উঠ না পিসীমা শোন।"

নিমন্ত্রণ পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইয়া মণিকা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পিসীমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'হলে সুধীরকে তো শীগগির যেতে হবে সেখানে—বোনের বিয়ে, না গেলে যে ভাল দেখায় না—"

"হ্যাঁ তাতো হবেই, কিন্তু—"

"কিন্তু কিরে মণি? তুই বুঝি যেতে দিবি না তা'কে?"

"আমিও যে যাব পিসীমা! বাবাকে বলে অন্ততঃ দুটী দিনের জন্যেও যদি আমাকে পাঠিয়ে দিতে পারো—তোমায দুটী পায়ে পড়ি পিসীমা!"

মণিকা সত্যই পিসীমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া কণ্ঠস্বরে মিনতি ও আগ্রহ ঢালিয়া বলিল, "বলবে পিসীমা বাবাকে?"

"ও কি করিস্ রে পাগলী?" পিসীমা শশব্যস্তে মণিকাকে তুলিয়া

আদরে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বলব রে বলব, কিন্তু বল্লেই কি তোর বাপ্ শুনবে মণি? সে যে তোকে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারে না।"

"তবু তুমি একবার ভাল করে বুঝিয়ে বলো পিসীমা।"

"কিন্তু তুই নিজেই বল্ না মণি?"

"না পিসীমা, আমার বড় লজ্জা করে।"

"আচ্ছা তা'হলে আমিই বলে দেখি একবার। মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাবে, এ তো কোনও নতুন কথা নয়! সেই চিরন্তন কাল থেকেই তো জগতে এই নিয়ম চলে আসছে মা! তবে যোগুর স্বতন্ত্র কথা।

মণিকা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমি তো সেখানে থাক্তে যাচ্ছি না। শুধু দুটো দিনের জন্যে যেতে চাই—"

"আচ্ছা, যোগু বাড়ী এলেই বলব'খন।"

মণিকা আশ্বস্ত হইয়া স্বামীকে এই সুসংবাদ জানাইতে ছুটিল।

যোগেশ্বর বাবু দ্বিপ্রহরিক ভোজনে বসিলে, মহামায়া এক সময় কথাটা তুলিলেন, বলিলেন, "যোগু, মণির ননদের যে বিয়ে, শুনেছ?"

"হ্যাঁ দিদি শুনেছি বই কি, বেয়াই যে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছেন।"

"তা'হলে সুধীরকে তো যেতে হবে।"

"তাতো হবেই, যাক্ না, একবার দেখে শুনে আসুক, দেরি করলে তো চলবে না, এক্জামিন আসছে আবার।"

মহামায়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "জামাই তো যাবেই। এদিকে তোমার মেয়েটীও যে ক্ষেপেছে যোগু! মণি যে আমায় এড়ে বেড়ে ধরেছে ননদের বিয়েয় যাবে বলে—"

যোগেশ্বর বাবু আহার হইতে বিরত হইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "সে আবার কি? মণি আবার কোথায় যাবে?"

মণিকা অদূরে দাঁড়াইয়া পিতার আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছিল, কথাটা শুনিতেই সে অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

মহামায়া মণির দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া ভ্রাতাকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, "তা ছেলে মানুষ ধরেছে, দাও না। দুদিনের জন্যে পাঠিয়ে ভাই, একটু বেড়িয়ে চেড়িয়ে আসুক, ননদের বিয়ে, আমোদ আহ্লাদ করবে, সব মেয়েদেরই তো মনের একটা সাধ আহ্লাদ আছে।"

"তাতো আছে, কিন্তু তুমি পাগল হয়েছ দিদি? মণিকে সেখানে কোথায় পাঠাব? তাদের—"

মহামায়া এবার কিছু বিরক্ত হইয়া তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন, "তা হোক্, তবু শ্বশুর বাড়ী মেয়ে পাঠান এতই কি অগৌরবের কথা—"

"অগৌরবের কথা নয়, তাতো আমিও জানি দিদি! কিন্তু যে শ্বশুর বাড়ী মণির, সেখানে ও কি দুটো দিনও টিঁক্‌তে পারবে মনে করেছ? মহাভারত! তার ওপর আবার বিয়েবাড়ীর হাঙ্গামা আছে, অনিয়ম অনাচারে শেষে যদি মেয়েটার একটা অসুখবিসুখ করে, তখন কি হবে?"

ইহার পর আর অনুরোধ উপরোধ করা চলে না। মহামায়া একটা ব্যর্থতার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা'হলে মণিকে কি বলব? আহা! ছেলে মানুষ, বড় আশা করে—"

"মণি গেল কোথায়? তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও, আমি বুঝিয়ে দেব'খন। সে যে নেহাত বাচ্ছা, ভাল মন্দ কি বোঝে বল?"

দ্বারান্তলবর্ত্তিনী মণির দিকে চাহিয়া মহামায়া বলিলেন, "ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে আয় না মণি!"

মণিকা সঙ্কুচিত হইয়া ধীরে ধীরে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যোগেশ্বর মেয়ের পানে চাহিয়া একটুখানি কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, কিরে বুড়ী মা! তোর নাকি শ্বশুর বাড়ী যেতে সাধ হয়েছে?"

মণিকা মাথা হেঁট করিয়া লজ্জা নম্র মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। যোগেশ্বর বাবু স্নেহ ভরা কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "ভেবেছ, সে বুঝি বড় সুখের ঠাঁই? তা'নয় মা, তা'নয়, আপন শ্বশুর শ্বাশুড়ী থাক্‌লেও বা একটা কথা ছিল, এ যে একেবারে কষ্টের এক শেষ হবে গেলে, বুঝছ না?"

কন্যাকে তখনও নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, যোগেশ্বর মমতা মাখা ব্যথিত স্বরে কহিলেন, "অমন অন্যায় আব্দার করিস্‌নে লক্ষ্মী মা আমার! তুই চলে গেলে, তোর এ বুড়ো খোকাটীকে কে দেখ্‌বে মণি? সে যে বড্ড কাঁদবে!"

চির স্নেহময় পিতার এই স্নেহভরা প্রবোধ বচনে মণিকার হতাশ ক্ষুব্ধ মুখে সলজ্জ স্নেহের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে নত নেত্রে মৃদু স্বরে বলিল, "থাক্‌, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না বাবা!"

বারো।

আজ দুপুরের ট্রেণে সুধীর গাজিপুরে যাত্রা করিবে। মণিকা তাই স্বহস্তে স্বামীর ট্রাঙ্ক্ গুছাইয়া দিতেছিল। একখানা বড় তোয়ালে জড়ানো কতকগুলি দ্রব্য লইয়া যোগেশ্বর বাবু ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, "মণি মা!"

"কি বাবা? ও আবার কি আন্‌লে—"

"এই দেখ না, তোমার ননদের বিয়ের যৌতুক দেবার জন্যে এগুলো নিয়ে এলুম, দেখ দেখি কেমন জিনিস—"

একটুক্‌রা সাদা পাতলা কাপড়ে জড়ানো উজ্জ্বল চওড়া জরীর পাড় লতা-পুষ্পে শোভিত একখানি ভায়লেট রংয়ের সূক্ষ্ম জম্‌কাল বেনারসী সাড়ী এবং তাহারই ব্লাউস্ পিস্ একটা, আর সেই রংয়েরই চওড়া লেস্ ও জরীর কাজ করা সিল্কের, সেমিজ, আর একটী ভেলভেট মণ্ডিত সুদৃশ্য 'কেসে' রক্ষিত একছড়া মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত জড়োয়া 'পুষ্পহার' মণিকার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া যোগেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ তো, জিনিসগুলো তোমার পছন্দ হয় কি না?"

সেই সুন্দর বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারের অসামান্য সৌন্দর্য্য ও সমুজ্জ্বল দীপ্তি যেন চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছিল। মণিকা প্রফুল্লস্মিত মুখে সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "পছন্দ হবে না? এ যে ভারি চমৎকার জিনিস বাবা! কিন্তু খুব দামী, বোধ হয় অনেক টাকার।"

আশা ভঙ্গে দুঃখিতা মেয়েটীকে বিনোদিত করিবার উদ্দেশ্যেই স্নেহময়

পিতার এই সযত্ন আয়োজন—তাই মণির হর্ষোজ্জ্বল মুখখানি তৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে সাফল্যের আনন্দে ও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া যোগেশ্বর বাবু প্রসন্ন হাস্যে কহিলেন, "টাকার তো তোমার অভাব নেই মা, হ'লই বা একটু দামী, কিন্তু বেছে বেছে এমন জিনিস এনে দিয়েছি, যা তা'রা বোধ হয় কখনো চক্ষেও দেখেনি।"

কথাগুলো শুধু স্নেহবশে বলা হইলেও তাহার মধ্যে যে একটুখানি শ্লেষের আভাস প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা আনন্দিতা মণিকার মর্ম্মে আঘাত করিতে ছাড়িল না। তাহার স্বামী গৃহের দৈন্য ও হীনাবস্থার কথা জানিয়াই তো পিতা তাহাকে সেই ঘরেই দিয়াছিলেন,—তবে এই সব তুচ্ছ কথা তুলিয়া সেই দরিদ্র ঘরের বধূ মণিকাকে লজ্জিত ও অপদস্থ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল ?

গোধূলি বেলায় ম্লানায়মান শেষ নীলিমাটুকুর মত মণিকার হর্ষদীপ্ত মুখের প্রসন্নতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। যোগেশ্বর তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "ভাল করে তোরঙ্গে গুছিয়ে রেখে দাও এগুলো, আর হার ছড়াটা সব কাপড়চোপড়ের তলায় সাবধানে রেখো মা, সুধীরকে বলে দিও, সেখানে গিয়েই যেন বার করে বেয়ানের হাতে দেয়—বুঝলে ?"

মণিকা তখনও কথা কহিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া "হুঁা" বলিল।

কন্যাকে অধিকতর আনন্দ দিবার অভিপ্রায়ে যোগেশ্বর আবার বলিলেন, "হ্যাঁ দেখ মা! সুধীরকে বলে দিলুম, তার নামে সেভিং ব্যাঙ্কে যে টাকা আছে, তাই থেকে কিছু টাকাও নিয়ে যেতে, তা'রা ছা-পোষা

মানুষ, আর আজকালকার বাজারে মেয়ের বিয়ে তো সহজ ব্যাপার নয়? কি বল মা! ভাল করিনি?”

মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেও মণিকা মুখে কিছুমাত্র আনন্দ বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল না। সে নত মুখে ধীর স্বরে শুধু বলিল, “বেশ করেছেন বাবা!”

নারী হৃদয়ের অজানা গোপন রহস্য বুঝিতে অক্ষম সরল প্রাণ বৃদ্ধ অত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়া সানন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন। পিতা দৃষ্টির অন্তর হইবামাত্র মণিকার সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল, হাতের কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া সে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল। পিতা আজ যে কথাগুলি বলিলেন, তাহার যথার্থতা সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহ নাই, তবে মণি অমন হঠাৎ রাগ করিল কেন? পিতার এই অযাচিত করুণা ও অতুলনীয় স্নেহের প্রতিদানে একটুখানি কৃতজ্ঞতাও ব্যক্ত করিতে পারিল না,—সে এম্নি কৃতঘ্ন!

“একি গো! এত সব জিনিষপত্র সঙ্গে দিয়ে, আমাকে কি নির্ব্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি মণি?”

সুধীর হাস্য প্রফুল্ল মুখে ঘরে ঢুকিতেই মণিকা যেন চমকিত হইয়া বলিল, “বাঃ বিয়ে বাড়ীতে কি অম্নি যাবে নাকি? দেখ, বাবা এই কাপড় গয়না ঠাকুরঝির জন্যে দিয়ে গেলেন, আমার তো যাওয়া হল না, এগুলো তুমিই দিও ঠাকুরঝিকে, পরিয়ে দেখো কেমন মানায়।”

সুধীর উপহার সামগ্রীগুলি দেখিতে দেখিতে প্রীতিবিকসিত মুখে বলিল, “খুব মানাবে মণি,—জিনিষগুলো বাস্তবিক বড় সুন্দর হয়েছে, রাণী ভারি খুসী হবে।”

মণিকা বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "ঠাকুরঝির হাসি মুখ তুমিই দেখ, আমার তো কপালে নেই! এখানে একলাটী বসে শুধু দিন গুণব—"

আশাভঙ্গজনিত বেদনা এবং প্রিয় দয়িতের আসন্ন বিরহ সম্ভাবনায় মণির কোমল চিত্ত ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ব্যথা ও ব্যাকুলতা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, তুমি কদ্দিনে ফির্‌বে বল তো? বেশী দেরি করো না কিন্তু, তা'হলে—"

"তা'হলে কি হবে মণি?"

"কি হবে তা জানো না? না গো, ঠাট্টা নয় সত্যি, তুমি ঠাকুরঝির বিয়ে হয়ে গেলেই চলে এসো, দেরী করো না বুঝলে?"

সুধীর পত্নীর আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়া সহাস্যে কহিল, "এতো অনুরোধ নয় মণি, আদেশ একেবারে অলঙ্ঘ্য? কিন্তু যদি এ আদেশ লঙ্ঘন করি, তা'হলে কি শাস্তি হবে শুনি?"

"শাস্তি! কত আর বলব বল, যতদূর আমার ক্ষমতা তাই করব, অর্থাৎ অনাহার, অনিদ্রা, কান্না এই সব অনিয়মে একটা কিছু অসুখ বাধিয়ে—" মণিকা আর বলিতে পারিল না, তাহার কালো চোখ দুটীতে সত্যই অশ্রুর আভাস জাগিয়া উঠিল, অভিমান ও উত্তেজনায় গোলাপের পাপ্‌ড়ীর মত পাতলা ঠোঁট দুখানি মৃদু মৃদু কাঁপিতে লাগিল।

মমতাময়ী মণিকার বালিকা সুলভ সরলতা এবং প্রেমের গভীরতায় বিস্মিত বিমোহিত হইয়া গিয়া সুধীর অভিমানিনী পত্নীকে প্রেমময় বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া, স্নেহাকুল আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, "না না, অমন সব দুষ্টুমী করে আমার লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিও না মণি, দোহাই তোমার!

মেয়ের বাপ।

তোমাকে ছেড়ে আমি কবে বেশী দিন থাকৃতে পেরেছি বল তো? কাজটা শেষ হয়ে গেলেই চলে আসব দেখো! তুমি কিন্তু বেশ হেসে খেলে মনের আনন্দে লক্ষ্মীটী হয়ে থেক, বুঝলে মাণিক আমার?"

যথাসময়ে সুধীর মণিকার কাছে বিদায় গ্রহণ করিল। ফলতঃ মোটরকার হইতে যতদূর দেখা যায়, সে দেখিতে লাগিল মণিকা উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে, ব্যথাম্লান সজল চক্ষে তাহারই পানে অনিমেষে চাহিয়া আছে। সুধীর উন্মনা, উদাস হইয়া উঠিল। এই প্রেমময়ীর নিবিড় দুশ্ছেদ্য প্রেমের বাঁধনে ধরা না দিয়া কি থাকা যায়?

বহুদিন পরে গৃহাগত সুধীরকে পাইয়া বিবাহ বাড়ীর আনন্দ কলোচ্ছ্বাস দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

অবিনাশবাবু পরমানন্দে ভাগিনেয়কে সাদর সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্ন করিলেন। এক তিনি ছাড়া বাড়ীর আর সকলেই, বধূকে সঙ্গে করিয়া না আনার জন্য অভিযোগ ও অনুযোগ তুলিয়া সুধীরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

পুষ্পরাণী অভিমান ভরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "বাঃ রে! এদ্দিন পরে এলে দাদা তবু বৌদিকে নিয়ে এলে না? সেই বিয়ের কনেটী এসেছিল, তারপর আর একটীবার দেখ্‌তেও কি সাধ যায় না আমাদের?"

নীরদা কন্যার পক্ষ সমর্থন করিয়া সানুযোগে কহিলেন, "সত্যি সুধীর, বউমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে ক্ষতিটা কি হ'ত বাবা? বিয়ের ক'দিন ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসে আমোদ আহ্লাদ করত, সেই বা কেমন দেখা তো! এখন পাঁচজনে যে পাঁচ কথা বলছে, আর সত্যি, বউয়ের ওপর আমাদেরও একটা অধিকার আছে তো?"

সুধীর মনে মনে হাসিয়া স্বগতই বলিল, অধিকার রাখার তো তোমরা কাজ করনি মামীমা !”

তাহাকে নীরব দেখিয়া নীরদা পুনরায় প্রশ্ন করিল, “বৌমা বুঝি নিজেই আস্‌তে চাইলে না, হ্যাঁ সুধীর ?”

সুধীর কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, “না মামীমা, সে তো আসবার জন্যে তয়ের হয়েছিল, কিন্তু শ্বশুর মশাই কিছুতেই রাজি হলেন না যে।”

নীরদা অপ্রসন্ন মুখে বলিল, “বেয়াইয়ের এ যে ভারি অন্যায় বাপু ! গরীবের ঘর ব’লে কাজে কর্ম্মে কোনও দিন মেয়ে পাঠালেও কি তাঁর মান্যটা খাটো হয়ে যেত ! এ যে সব বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি।”

সুধীর মামীমার রাগ দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, “তা বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করেছ যখন, তখন অমন একটু আধটু বাড়াবাড়ি সইতে হবে বই কি মামীমা ! তা’র জন্যে রাগ দুঃখ করা তো চলবে না !”

কিন্তু সেই বড়লোক কুটুম্ব প্রদত্ত উপঢৌকন সামগ্রী দেখিবামাত্র নীরদার সমস্ত রাগ ও ক্ষোভ এক মুহূর্ত্তে যেন জুড়াইয়া জল হইয়া গেল। মহা আনন্দে সেগুলি বিবাহ বাড়ীর অভ্যাগতগণকে দেখাইয়া এবং তাহাদের অজস্র প্রশংসাবাণীতে পুলকিত হইয়া সে সুধীরের সাক্ষাতে স্পষ্ট কথায় স্বীকার করিল, “বেয়াইয়ের বেশ পছন্দ আছে কিন্তু, তত্ত্ব দেখে ধন্যি ধন্যি করতে লেগেছে। সত্যি, সবাই এমন নইলে কি কুটুম্বিতের সুখ হয় ? মিন্সের আর সব ভাল, কেবল ঐ এক দোষ, প্রাণান্তে মেয়ে পাঠাবে না !”

নীরদার সেই পরিপূর্ণ হর্ষোচ্ছ্বাসে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া

বিমনা সুধীরও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, "এগুলো রাণীকে পরিয়ে দাও না মামীমা, আমি একবার দেখি।"

যথাসময়ে নূতন বেশভূষায় সজ্জিতা তন্বী কিশোরী পুষ্পরাণী সলজ্জ মৃদু গতিতে আসিয়া ভ্রাতার চরণে প্রণতা হইল। আদরের বোনটীর সেই নূতন বেশ ও চন্দনচর্চ্চিত তরুণ শ্রীমণ্ডিত ব্রীড়াবনত মুখখানি প্রীতিবিমুগ্ধ তৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে সুধীর পুলকিত স্বরে বলিল, "বাঃ! এ কাপড়ে তোকে বেশ মানিয়েছে তো রাণী! ও ঠিকই বলেছিল—"

"কে, বৌদি?"

"হ্যাঁ, তা'র বড় সাধ ছিল নিজের হাতে তোকে মনের মত করে সাজিয়ে দেয়, কিন্তু বেচারি আসতেই পেলে না, তা কি হবে।"

পুষ্পরাণী স্মিতস্নিগ্ধমুখে বলিল, "আমি তো তোমায় আগেই বলেছিলুম দাদা, আমার বউদি খুব লক্ষ্মীটী হবে দেখ, এখন দেখ্‌লে তো? কিন্তু এমন লক্ষ্মী বউদির সঙ্গে ভালি করে আলাপও করতে পেলুম না, এই যা দুঃখ। হ্যাঁ দাদা! বউদি কি আমাদের ভুলে গেছে, না কখনও মনে করে?"

"না রাণী! সে কাউকেই ভোলেনি, বিশেষতঃ তো'র কথা তো সদাসর্ব্বদাই বলে থাকে।" বলিতে বলিতে উন্মনা সুধীরের মনে চকিতে জাগিয়া উঠিল, মণির বিদায় মুহূর্ত্তের সেই ব্যাকুলতা ও ব্যথাম্লান ছল ছল আঁখি দুটী! মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "সে তো স্বাধীন নয় রাণী, নইলে তোর বিয়েতে না এসে কি থাকে?"

পরদিন বিবাহ। বিবাহবাটীর কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে ব্যস্ত ও ব্যাপৃত সুধীর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পায় নাই, তথাপি তাহার কেবলই মনে

হইতেছিল, সমস্ত কাজ ও আনন্দ সমারোহের পরিপূর্ণতার মধ্যে কোথায় একটা মস্ত ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। দুখানি আনন্দ চঞ্চল আল্‌তা মাখা চরণ স্পর্শের অভাবে সেই হর্ষমুখর পরিণয় মণ্ডপ যেন বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে!

বিবাহের লগ্ন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর। বরকন্যাকে বাসর ঘরে পাঠাইয়া এবং "এইবার তো শোধ বোধ হয়ে গেল!" এই বলিয়া নূতন ভগিনীপতি বিনয়ের কাণ দুটী নূতন উদ্যমে আশ মিটাইয়া মলিয়া দিয়া, সুধীর যখন একটুখানি বিশ্রাম লইতে পাশের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল, তখন সুখনিশি অবসান হইয়া আসিয়াছে। সুখবাসরের চঞ্চল হাস্যকলোচ্ছ্বাস বসন্তের পুলক-চঞ্চল হাল্‌কা বাতাসের মত থাকিয়া থাকিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল।

হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া একটী তরুণী মেয়ে মধুবর্ষী মৃদু কোমল কণ্ঠে গান গাহিতেছিল—

"যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হ'ল মরি লাজে!"

তরল তন্দ্রাবেশে আবিষ্ট সুধীর, সেই সুমিষ্ট সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া, সজাগ হইয়া উঠিল। একটা অব্যক্ত ব্যথার তীব্র অনুভূতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, সুধীর ব্যথিত চিত্তে চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিল, মণি এখন কি করিতেছে, কে জানে? আহা বেচারি মণি! সে হয় তো তাহারই চিন্তায় বিভোর হইয়া সারানিশি বিরহ শয়নে জাগিয়া এতক্ষণে শ্রান্ত হইয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! বালিশের উপর তাহার আলু থালু শিথিল কেশে ঢাকা ঘুমন্ত সুন্দর মুখখানি কিশলয় বেষ্টিত গোলাপের

মত নিথর সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া আছে,—প্রেমিকের প্রেমালস তৃষিত অধর স্পর্শে আজ আর সে হাসিয়া জাগিয়া উঠিবে না!

তাহার প্রাণের মণি,—দুষ্ট মণিকে সুধীর তো ভাল করিয়াই জানে! সে যে একমুহূর্ত্তও তাহার প্রেমাস্পদকে দৃষ্টির অন্তর করিতে চায় না।

পরদিন বরকন্যা বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন সুধীরও বিদায় প্রার্থনা করিয়া বসিল, তখন অবিনাশবাবু আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "বড় লোকের জামাই হয়ে ছেলের চাল বেড়ে গেছে, এখন গরীব মামার ঘরে থাকতে ভাল লাগবে কেন?

নীরদা প্রকৃতই দুঃখিত হইয়া প্রণত সুধীরকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া সাশ্রু নয়নে বলিল, "গরীব মামীমাকে একেবারেই ভুলে যাসনি বাবা, —মনে করে মাঝে মাঝে দেখা দিস—"

পিতামাতা স্নেহনীড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কায় ভীতা, কাতরা পুষ্পরাণী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চক্ষের জলে হাসি ফুটাইয়া মনে মনে বলিল, "বউদি আমার দাদাটিকে বাস্তবিক কি গুণ করেছে, দুটো দিনও ছেড়ে থাক্‌তে পারেন না!"

তেরো

সুধীরের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষান্তে বিনয় বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। আর সুধীর বহুদিন পরে নির্দ্দিষ্ট দীর্ঘ অবকাশ লাভ করিয়া তাহার প্রিয়তমার সুমধুর অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ সুখটুকু অবাধে উপভোগ করিয়া সুখে দিন কাটাইতেছে।

নিদাঘের আতপ-তাপ তপ্ত ক্লান্ত অপরাহ্ন, মণিকা তাহার নিভৃত ঘরটীতে সুবৃহৎ স্বচ্ছ মুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধিতেছিল, এ কাজটী পূর্ব্বে পিসীমা বা গিন্নিঝির দ্বারায় সম্পাদিত হইত, কিন্তু এখন সেই একঘেয়ে পুরাতন ফ্যাসানে চুল বাঁধা মণির আর পছন্দ হইত না, তাই নিজের হাতে মনের মত করিয়া কেশ বন্ধনের প্রয়াসে, সেই নিবিড় বিপুল কেশভার লইয়া মণিকা মাথার উপর অবিরল ঘুর্ণিত ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের বেগে সঞ্চালিত স্নিগ্ধ শীতল বাতাসেও বিব্রত, গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছিল।

অবাধ্য চঞ্চল কুন্তলদাম বহু যত্নে আয়ত্ব করিয়া, মণিকা—সবেমাত্র বেণীবন্ধন সমাপ্ত করিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে বিনয় ডাকিল, "বউদি! ভেতরে যেতে পারি কি ?"

মণিকা সচকিতে পৃষ্ঠে বিলম্বিত দীর্ঘ-বেণীর উপর একটুখানি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া বলিল, "আসুন না,—আসুন—"

দরজার সবুজ পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতেই বিনয় থতমত খাইয়া বলিল, "এঃ! বড় অসময়ে এসে পড়েছি তো বউদি,—সুধীরটা গেল কোথায় ?"

মেয়ের বাপ।

"এই খানিকক্ষণ হ'ল কোথায় গেছেন,—আপনি বসুন না!"

"তাতো বসবই।"

বিনয় আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারপর খবর কি বউদি? নতুন কিছু?"

মণিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নতুন খবর কিছুই দিতে পারলুম না—আপনি এরি মধ্যে ফিরলেন যে? বাড়ীর সব ভাল তো?"

"সব ভাল। কিন্তু তুমি যদি আমাকে সকল সময় এ রকম আজ্ঞে প্রাজ্ঞে কর বউদি, তা'হলে সত্যি বলছি, আমি আর কক্ষণো তোমার কাছে আসব না!"

মণিকা সলজ্জ সঙ্কোচে কহিল, "কিন্তু আপনি যে আমার চেয়ে ঢের বড়—"

"বয়সে বড় হলে কি হয় সম্পর্কে তো বড় নয়? আজকাল সুধীর যে আমার দাদা হয়ে বসেছে গো!" বলিতে বলিতে বিনয় উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। কৌতুক চঞ্চল কণ্ঠে সে বলিল, "বাস্তবিক বউদি! সুধীরটাকে ভাগ্যিস্ সে দিন ঝড়্ বৃষ্টির মধ্যে টেনে এনেছিলুম, তাই তো এমন লক্ষ্মীর প্রতিমা বউদি লাভ হল? সেদিনের সেই সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করে যে, এত সব আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটতে পারে, এ কি তখন ভেবেছিলুম?"

মণিকার আনত মুখে লজ্জার অরুণিমা ফুটিয়া উঠিল, সে মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন? এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয়টা কি আছে?"

"বাঃ আশ্চর্য্য নয়? কোথাকার কে সুধীর, সে উড়ে এসে তোমার হৃদয় সিংহাসন জুড়ে রাজা হয়ে বস্‌ল, আর আমি হয়ে গেলাম কি না

তোমার ঠাকুর জামাই,—অর্থাৎ ঠাকুরঝির হর্তাকর্তা বিধাতা! এ সমস্তই কি অভাবিত নয়?"

বিনয়ের কথা বলিবার ভঙ্গীতে আমোদিত হইয়া মণিকা মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ওরে বাবা! একেবারে হর্তাকর্তা বিধাতা! ঠাকুরঝি কি তাই বলে নাকি?"

"মুখে না বল্লেও কথাটা তো মনে মনে স্বীকার করতে হয়, সব মেয়েকেই—"

"ওমা তাই নাকি! আমি যে তা করি না!—"

মণিকার কৌতুকোজ্জ্বল স্মিতমুখের পানে দৃক্‌পাত করিয়া, বিনয় হাস্যরঞ্জিত অধরে বলিল, "আহা গো! তাই তো! তাই বুঝি সুধীর যখন আমার বিয়েতে তিনটি দিনের জন্য বাড়ী যায়, তখন রাতের পর রাত জেগে কেঁদে বুক ভাসান হয়েছিল?—আমি সব জানি গো ঠাকরুণ! সব জানি—আমার কাছে তোমাদের কিছুই লুকোন চলবে না!"

লজ্জায় আরক্ত হইয়া মণিকা বিনয়ের আক্রমণ হইতে পলাইয়া, আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ব্যস্ততা দেখাইয়া বলিল, "ঐ যাঃ! কি ভোলা মন আমার!—মানুষটা এই রোদের মধ্যে এতদূর এল, একটু খাবার, কি এক গেলাস সরবৎ কিছুই দিলুম না—বসো ঠাকুর জামাই, আমি এখনি আসছি—"

লজ্জিতা মণিকার মনের ইচ্ছা বুঝিয়া বিনয় সহাস্যে বলিল, "ঘূস দিয়ে মুখ বন্ধ করা হবে বুঝি? কিন্তু আমি তোমার এমন ঘুস্‌খোর ঠাকুর জামাই নই বউদি, হুঁ—" কথাটা বলিয়া বিনয় খুব একচোট হাসিয়া লইল।

মণিকাও তাহার ঠোঁটের কোণের উথলিয়া পড়া হাসিটুকু চাপিতে

চাপিতে বলিল, "বেশ!—আমি কি সেইজন্যই বলছি? ক্ষিদে তেষ্টা পায় না কি মানুষের?"

"খুব পায়! বিশেষতঃ আমার মত পেটুক মানুষের ক্ষিদের উৎপাত তো সর্ব্বক্ষণই লেগে আছে,—জ্বালাতন আর কি! আচ্ছা বউদি, আমার হ্যাংলামোর কথা তোমরা সব গোড়া থেকেই জেনে গেছ কেমন করে বল দেখি? সেদিন তোমার বাবার সুমুখে বুভুক্ষুর মত সমস্ত খাবারগুলো খেয়ে ফেলেছিলুম বলেই কি?—বাস্তবিক বউদি, মেসের অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার মুখে, সে যেন অমৃতের মতই লেগেছিল!"

মণিকা হাসিমুখে একখানি রেকাবীতে মিষ্টান্ন আর একখানিতে ফল সাজাইয়া লইয়া আসিল। গিন্নিঝি এক গ্লাস চন্দনের স্নিগ্ধ সরবৎ ও রূপার ডিবায় সুগন্ধি পানের খিলি রাখিয়া গেল।

তৃষ্ণার্ত্ত বিনয় অনুরোধ উপোরোধের অপেক্ষা না করিয়া এক নিঃশ্বাসে সমস্ত সরবতটুকু নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল, তাহার পর একটা সুপক্ক ফজলী আমের চোকলায় কামড় দিয়া বলিল, "বাঃ! চমৎকার মিষ্টি আম তো! এত মিষ্টতা কি আন্‌বার লোকের হাতের গুণে না কি?"

মণিকাকে লজ্জায় মুখ ফিরাইতে দেখিয়া বিনয় সহাস্যে বলিল, "আচ্ছা বউদি—এইবার ঠাট্টার পালা শেষ, এখন ঘরকন্নার কথা সুরু করা যাক্ কেমন? কিন্তু সুধীরটা আস্‌বে কতক্ষণে? আজ যে বড় সে বেরিয়েছে? তার তো কোনও দিন টিকিটিও দেখতে পাওয়া যেত না?"

"সব দিন কি মানুষের সমান যেতে পারে?"

"সকলের তো যেতে পারে না বটে, কিন্তু তোমাদের যে ভিন্ন কথা বউদি?"

"কেন আমরা কি এ জগতের জীব নয় নাকি?"

"না, কখনই না, তোমরা দুটীতে যেন সেই কি বলে?—কপোত কপোতী সুখে উচ্চচূড়ে বাঁধি নীড়—যাঃ! বাকীটা ভুলে গেলুম যে বউদি!"

মণিকা মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাহবা! এত কবিত্ব ক'ার কাছে শেখা হয়েছে কবি মশাই? ঠাকুরঝির কাছে কি?"

বিনয় আমের পাতলা আঁটিটা চুষিতে চুষিতে রঙ্গ করিয়া বলিল, 'আহা! চোরে কামারে দেখা আছে নাকি? ঠাকুরঝির সঙ্গে অভাগা ঠাকুর জামাইটার ক'দিনেরই বা আলাপ—"

"কেন, চাক্ষুষ আলাপ না হলেও, চিঠিতে তো নিত্যই আলাপ করা চলে?"

"উহুঁ, সে সব পাটও বেশী নেই বউদি।"

"সে কি? না না, মিছে কথা!"

"না বউদি! একটুও মিছে কথা বলিনি।"

"ওমা! তাই নাকি?"

অতিমাত্র বিস্ময়ে মণিকার দীর্ঘায়ত চক্ষু দুটী বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। যেন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না!

তাহার সেই বিস্ময়াপন্ন ভাব দেখিয়া বিনয় সহাস্যে বলিল, "একেবারেই অবাক্ হয়ে গেলে যে বউদি? কিন্তু আমাদের মত লোকের এত প্রেমচর্চ্চা করবার অবকাশ কোথায় বল? এই রেজাল্ট বেরুতে যা দেরী,—তারপর কে কোথায় থাকে, তার ঠিক্ নেই!" কথাটার সঙ্গে সঙ্গে বিনয় ফোঁস করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

দুটী করুণ হৃদয়ের কল্পিত বিরহ ব্যথা মনে মনে অনুভব করিয়া

কোমল প্রকৃতি মণিকা ম্রিয়মাণ হইয়া আন্তরিক সহানুভূতির সহিত বলিল, "লক্ষ্ণৌয়ে ডাক্তারি পড়তে যাবে বুঝি? পাঁচ ছ বছর সেইখানেই থাকতে হবে, না? বাপ্ রে! সে যে অনেক দিন! অতদিন কি করে—" মণিকা লজ্জায় কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

বিনয় তাহার মুখের অসমাপ্ত কথার উত্তরে বলিল, "এতদিন ছাড়া ছাড়ি হয়ে কি করে থাকব, তাই বুঝি জিজ্ঞাসা করছ বউদি! কিন্তু না থেকে উপায়! তোমাদের মত নিশ্চিন্ত নিছক মিলন সুখ ভগবান ক'জনের ভাগ্যে দিয়েছেন বল?"

বিনয়ের আহার ও দুঃখের কাহিনীর মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া সুধীর বিস্মিত আনন্দে বলিয়া উঠিল, "আ গেল যা! এখানে বসে কাঁড়ি গেলা হচ্ছে, আর আমি সৃষ্টি খুঁজে মরলুম! এই ক্ষুদে রাক্ষসটাকে এত আস্কারা দিও না মণি, ত'াহলে খেয়ে তোমার ভূত ভাগিয়ে দেবে! তার পর? মশায়ের আসা হ'ল কখন? সোজা এখানে না এসে, মেসে নামা হয়েছে কি বড় মান্‌সি দেখাবার জন্যে?"

একটা বড় রসগোল্লা মুখে পুরিয়া বিনয় বিকৃত স্বরে বলিল, "চুপ্ এখন সময়াভাব!"

"তা'হলে এগুলো শীগগিরি শেষ করে ফেলতে হচ্ছে যে" বলিয়া সুধীরও বিনয়ের খাবারে ভাগ বসাইয়া দিল। মণিকা বলিল, "ওমা! তুমিও ওঁর খাবারে ভাগ বসালে এসে! তা'হলে যাই, আরও খাবার নিয়ে আসি।"

বিনয় নিষেধ করিয়া বলিল, "না বউদি থাক্, এতেই দুজনের ঢের্ হয়ে যাবে।"

সুধীর গমনোদ্যতা মণিকার আঁচল ধরিয়া বলিল, "তুমি বসো মণি, তোমার ঠাকুর জামাইটী তো দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসেননি?"

মণিকা অগত্যা নিকটে বসিয়া উভয় বন্ধুর কাড়াকাড়ি করিয়া আহার প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে দেখিতে লাগিল। বিনয় অবিলম্বে ভোজন শেষ করিয়া দুটী পানের খিলি মুখে পুরিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এইবার কি বল্‌ছিলি তা বল্ সুধীর!"

সুধীর বলিল, "বলাবলি আর করে কাজ নেই, চল মেসে গিয়ে তোর কি আসবাবপত্র আছে নিয়ে আসিগে।"

বিনয় বলিল, "আমি তো আজই চলে যেতুম ভাই, শুধু ট্রেণের সময় পৌছুঁতে পারিনি বলেই এ বেলা রয়ে গেলুম, সেই রাত দুপুরের আগে আর গাড়ী পাচ্ছি না। এই কয় ঘণ্টা সময়ের জন্যে আর কেন মিছে জিনিসপত্র নাড়ানাড়ি করা?"

"হ্যাঁ, আজুই আমি ছেড়ে দিচ্ছি কি না? কেন রে? দুটো দিন এখানে থেকে গেলে আর কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?"

"না ভাই, ওকে মার কাছে পৌছে দিয়ে তবে না আমি ছুটী পাব। মেডিকেল কলেজে ঢোকা আজকালকার দিনে তো সহজ কথা নয়, এখন থেকে চেষ্টা চরিত্র করতে হবে।"

মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরঝিকে নিতে যাচ্ছেন বুঝি? ওমা! এরি মধ্যে? এই তো সেদিন বিয়ে হল!"

তাহার বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া সুধীর কৌতুকচ্ছলে কহিল, "কি করে বল? তোমার মত পিত্রালয়বাসিনী হওয়ার সৌভাগ্য তো সকলের হয় না মণি!"

কথাটা পরিহাসের ভাবে বলিলেও তাহার মধ্যে যে একটুখানি খোঁচা ছিল, তাহা মণিকার অন্তস্তলে বিদ্ধ হইয়া গেল। কুণ্ঠিত ক্ষুব্ধ মণিকার পক্ষ সমর্থন করিয়া বিনয় বলিল, "আজন্ম পিত্রালয়বাসিনী হওয়ার জন্যে বউদিকে এ রকম খোঁটা দেওয়া, তো'র কিন্তু ভারি অন্যায় সুধীর! ও বেচারি বাপের বাড়ী থাক্‌বে না তো যাবে কোথায়! আয়েস আরামের মধ্যে ডুবে থেকে তুই নিজেই তো নড়বার নাম করবি না, আর দোষ চাপাবি ওর ঘাড়ে—"

তাড়াতাড়ি আস্ফালন করিয়া সুধীর বলিল, "তবে একবার নড়ে, তোকে দেখিয়ে দেব নাকি?—হুঁ, আমি কি এম্নিই আলসে কুড়ে—"

"বিনয় মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "ওঃ! বাবুর বিক্রম দেখে যে আর বাঁচি না! কিন্তু নড়ে কোথায় যাওয়া হবে শুনি!"

"কেন? তোর সঙ্গে, বাড়ীতে,—সত্যি ঠাট্টা নয়, রাণীটা আবার কদ্দিনে আসতে পাবে, একবার দেখা করে আসি, কি বল মণি?"

হাসিতে হাসিতে বিনয় বলিল, "দেখ্‌লে বউদি! বোনের দিকে টান কত! লোকে যে বলে বিধাতা সতীনের মাটী দিয়ে ননদ গড়েছেন, তা কথাটা মিথ্যে নয় দেখছি! হ্যাঁরে সত্যি যাবি সুধীর? কিন্তু হার ম্যাজেষ্টির কাছ থেকে পারমিসান্ পাও তবে না?"

"তা পেয়ে যাব, হ্যাঁগা! কি বল, যাই?"

উত্তর প্রতীক্ষায় সুধীর বক্র কটাক্ষে অধোমুখী মণিকার দিকে চাহিয়া রহিল। মণিকা তাহার শঙ্কিত দুর্ব্বল মন ও শুষ্ক কণ্ঠ স্বরে জোর করিয়া দৃঢ়তা আনিয়া দৃপ্ত ভাবে কহিল, "যেতে ইচ্ছে হয় যাও না, আমি কি বারণ করছি নাকি?"

মণিকার ব্যথিতে মুখের পানে চাহিয়া বিনয় শশব্যস্তে বলিল, "তুমি মুখে না বল্লেও চোথ দুটী যে সেই কথাই বলছে বউদি ! না ভাই, সুধীর ! তোর আর গিয়ে কাজ নেই দেখছিস না, তোর যাওয়ার কথা শুনেই বেচারীর কি রকম মুখ শুকিয়ে গিয়েছে ! না বাপু ! এই প্রথম বউ আন্‌তে চলেছি, এ সময় কারুর মনে ব্যথা দিয়ে অভিসম্পাত কুড়োতে পারবো না আমি।"

মণিকা সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া লজ্জারুণ মুখে "যাই আমি পিসীমাকে বলে আসি ঠাকুর জামাই এ বেলা এখানেই খাবেন।" বলিয়া তাহার বিক্ষোভিত ভারগ্রস্ত চিত্ত লইয়া অন্তরালে চলিয়া গেল।

রাত্রে স্বামীকে নিভৃতে পাইয়া মণিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সত্যিই ঠাকুর জামাইয়ের সঙ্গে যাবে নাকি ?"

সুধীর বলিল, হাঁ, "তাইতো আজ বিনয়কে ধরে রাখলুম, কেন ? আমার যাওয়াটা কি এতই আশ্চর্য্যের কথা মণি, যে এখনো বিশ্বাস করতে পারছ না ?"

মণিকা কিছু অপ্রতিভ ও আহত হইয়া বলিল, "আমি কি তাই বলছি নাকি ? বেশ তো দুদিন বেড়িয়ে চেড়িয়ে এসগে, কিন্তু বাবাকে একবার জানিয়ে যেও, নইলে—"

বাধা প্রদান করিয়া সুধীর কিছু উষ্ণ স্বরেই বলিল, "বাবাকে না জিজ্ঞাসা করে চৌকাটের বাইরে পা বাড়াবার যো নেই, এ যে ভারি বিপদ দেখছি ! কিন্তু এ বাড়ীতে বিয়ে করেছি বলে সত্যি আমি কারুর কেনা গোলাম হয়ে যাই নি তো !"

কথাটা বলিবার অসঙ্গত ভঙ্গী ও ঝাঁজ্‌ দেখিয়া মণিকার অভিমান

ক্রোধে পরিণত হইল, সেও একটু উত্তেজিত হইয়া প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "এ কথা এখন তো বলবেই তুমি, কিন্তু যখন,—" বলিতে বলিতে উদ্যত রসনা সংযত করিয়া মণিকা সহসা থামিয়া গেল।

সুধীর রুষ্ট ও অপমানিত হইয়া সে রোষ-তীব্র-স্বরে কহিল, "যখন কি? কথাটা ভেঙ্গেই বল না মণি,—মিছে আর চেপে রাখ কেন? কিন্তু মনে রেখো, তোমার বাবা নিজেই আমাকে সেধে ধরে এনেছিলেন, আমি আপনা হতে তোমাদের বাড়ীচড়াও হয়ে আসিনি!"

নানা কারণে সংসারের নানাদিক হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাত প্রতিঘাত লাগিয়া দম্পতী যুগলের মনের কোথায় এক কোণে একটা বিরাগ ও বিদ্রোহীর ভাব ধীরে অজ্ঞাতে সঞ্চিত হইতেছিল, আজিকার এই অতি তুচ্ছ ঘটনায় তাহা প্রকটিত হইয়া উঠিল এবং সেই পরস্পর প্রেমবিভোর একান্ত অনুরক্ত অভিন্ন হৃদয় দুখানির মধ্যের সুদৃঢ় নিবিড়তম প্রীতিবন্ধন যেন কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া তুলিল।

সেজন্য মনে একটা গ্লানি ও বিরোধের ভাব লইয়া সুধীর তাহার পরদিন শ্বশুর মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই বিনয়ের সঙ্গে গাজিপুরে চলিয়া গেল এবং যাইবার সময় অনুতপ্তা মণিকা তাহার চিরদিনের অভ্যাস মত "কবে আসবে?" র্ উত্তরে সে "যখন ইচ্ছে" কথাটা বেশ একটু উদ্ধত ও রূঢ় ভাবেই বলিয়া গেল।

সুতরাং তাহাদের বিদায় মুহূর্ত্ত এবার আর তেমন ব্যথা ও করুণতায় সিঞ্চিত হইয়া মধুরতম হইয়া ফুটিল না।

চৌদ্দ।

"হ্যাঁ রে মণি! সুধীর কাউকে কিছু না বলে, আজ যে অমন হঠাৎ চলে গেল? যোগুকেও তো একবারটী জিজ্ঞেস করে গেল না, সে যে বড় রাগ করছে।"

মণিকা দ্বিতলের গঙ্গার দিকের খোলা বারান্দায় একলাটী মৌন স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে ক্রমশঃ ম্লানায়মান ভাগীরথীর অচঞ্চল শান্ত বারিরাশির পানে উদাস শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। পিসীমার প্রশ্নে সে মুখ না ফিরাইয়াই ক্লান্ত মৃদুস্বরে বলিল, "তা আমি কি জানি?"

মহামায়া কিছু বিস্মিত হইয়া গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, "ও মা সে কি কথা! তুমি জান্‌বে না তো জান্‌বে কে—পাড়ার লোক?"

মণিকা নীরবে লৌহময় কঠিন রেলিংয়ের উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িয়া যেন আরও নিবিষ্ট মনে গঙ্গাবক্ষের সান্ধ্যশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

উত্তর প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মহামায়া মনে মনে একটা কারণ উদ্ভাবন করিয়া মণিকার আরও কাছে আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে! জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিসনি তো, সে যা অভিমানী—"

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে তখনও নীরব নিশ্চল দেখিয়া মহামায়া বিরক্তি সহকারে উত্যক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "বল্ না বাপু, কি হয়েছে? অমন কাঠ

হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হ'বে?" সুধীর কবে ফিরবে, কিছু বলে গেল?"

মণিকা গম্ভীর ভাবে শুধু মস্তকান্দোলন করিয়া জানাইল 'না'।

মহামায়া আরও অপ্রসন্ন হইয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বলেও যায়নি!—সে কি কথা? এ যে সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বাপু!"

মণিকা এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, একটু উগ্র স্বরেই বলিয়া উঠিল, "সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড আবার কি হ'ল? ইচ্ছে হয়েছিল গিয়েছে, আবার যখন ইচ্ছে হয় ফিরবে, মানুষের ইচ্ছের ওপর তো কারুর জোর চলে না!"

মণিকাকে এমন স্পষ্ট কথায় স্বামীর স্বপক্ষে কথা বলিতে দেখিয়া, পিসীমা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "তা তো জানি মা, আজকাল জামাইয়ের ঘরপানে এত টান হ'ল কেন? রোজ রোজ শুধু শুধু বাড়ী যাওয়া—"

"তোমাদের বাড়ীর মেয়ে বিয়ে করে, সে তো চোর দায়ে ধরা পড়েনি পিসীমা!"

ব্যথা-হত আর্দ্রকণ্ঠে কথা কয়টী বলিয়া মণিকা শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত গুরু গম্ভীর মন্থর গমনে তাহার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রাত্রে আহারের জন্য মণিকে ডাকিতে আসিয়া গিন্নিঝি সবিস্ময়ে কহিল, "ও মা! ঘর অন্ধকার কেন দিদিমণি?" তথাপি দিদিমণির কোনও সাড়া শব্দ না পাওয়ায়, সে আলোর সুইচটা টিপিয়া দিয়া দেখিল, মণিকা শয্যার উপর আড়ষ্ট হইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া আছে। গিন্নিঝি

সমীপস্থ হইয়া বলিল, "দিদিমণি! ও দিদিমণি! এরি মধ্যে ঘুমুলে "নাকি গা? পিসীমা যে খেতে ডাকছেন—"

মণিকা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ধরা গলায় বলিল, "আজ আমি খাব না, ক্ষিদে নেই, পিসীমাকে বলে দাওগে যাও।"

"ও মা! সে কি কথা গো,—একেবারে কিচ্ছু খাবে না? এত বড় সোমত্ত মেয়ে—"

বাধা দিয়া মণিকা তর্জ্জন স্বরে বলিল, "তোমার আর গিন্নেপনা করতে হবে না, যাও নিজের কাজ দেখগে—"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গিন্নিঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং "ধন্যি মেয়ে বাপু!—দুদিনের জন্যে সোয়ামী কাছছাড়া হয়েছে, তা'তেই একেবারে ধরাশায়ী!—মেয়ের যেন সবই বাড়াবাড়ি" বলিয়া নিজের মনেই গজ্ গজ্ করিতে করিতে সে পিসীমাকে সংবাদ দিতে চলিল।

পরক্ষণেই পিসীমার ব্যস্ততার সহিত আবির্ভাবে মণিকাকে বাধ্য হইয়াই উঠিয়া বসিতে হইল। তাহার অশ্রুরেখা অঙ্কিত ম্লান করুণ মুখখানির পানে চাহিয়া পিসীমা সস্নেহে কহিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, একবার ওঠ, আমার কথা শোন।"

মণিকা ব্যথিত ভগ্ন কণ্ঠে কহিল, "না পিসীমা! এ বেলা আমি কিছু খেতে পারব না, সত্যি বলছি আমার ক্ষিদে নেই—"

"নাই থাক্ ক্ষিদে, তবু একটু কিছু মুখে দে, মিছে রাত উপোসী থেকে অকল্যাণ করিস কেন মা?"

মণিকা ব্যথাভরা অবজ্ঞার সহিত বলিল, "হুঁ, আমার আবার কল্যাণ অকল্যাণ কি পিসীমা?"

"ও মা ষাট্! ও কি অলক্ষুণে কথা?" আস্তে ব্যস্তে মণিকার গায়ে হাত দিয়া মহামায়া সাদরে বলিলেন, "তোমার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব মা! তুমি যে রাজকন্যা, রাজ আদরিণী!"

অশ্রুসিক্ত মুখে একটুখানি ম্লান চকিত হাসি হাসিয়া মণিকা বলিল, "রাজকন্যেদের বুঝি কোনও দুঃখ, কোনও অভাব অভিযোগ থাকতে নেই পিসীমা!"

"পাগলী কোথাকার!—এতটুকু যদি বুদ্ধি থাকে!—ও রে হাবি!— সংসারে থাক্‌তে গেলেই যে ঝগড়া ঝাঁটি একটু আধটু হয়েই থাকে, সে তো কোনও নতুন কথা নয়?—সে চালাক ছেলেটি তো ভগ্নিপতির সঙ্গে দিব্যি হাসতে হাসতে আমোদ করতে গেল, আর তুই এমন মনমরা হয়ে মিছে আহার নিদ্রে ত্যাগ করে—"

অভিমান ক্ষুব্ধ আহত কণ্ঠে মণি বলিল, "আহার নিদ্রে কে ত্যাগ করছে পিসীমা?—দিনে সাতবার গাণ্ডেপিণ্ডে গিলেছি, তবুও ঐ কথা বলবে—তোমাদের যে সকলতাতেই খালি জবরদস্তি!"

রজনী গভীরা। জ্যোৎস্না স্নাতা ফুল্ল নিশীথিনীর একান্ত শান্তিপূর্ণ গাঢ় নিস্তব্ধতা, সারা দিবসের কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত বিশ্ববাসীকে সুষুপ্তির মোহ ঘোরে ধীরে ধীরে মগ্ন অচেতন করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু মণিকার চক্ষে আজ নিদ্রা নাই, শ্রান্তি নাই। শূন্য শয্যায় ব্যথাতুর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পড়িয়া বিনিদ্র নয়নে মণিকা ভাবিতেছিল, সুধীরের স্নেহ হীন নিষ্করুণ ব্যবহারের কথা।

প্রায় দুই বৎসরের অধিককাল বিবাহ হইয়া পর্য্যন্তই, মণিকা প্রিয়তম স্বামীর অপরিমিত আদর সোহাগ অযাচিতে পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু

এতদিনে তাহার ব্যতিক্রম হইল কেন? হায়! আজ কেমন করিয়া কাহার অভিশাপে মণিকার প্রেম হিল্লোলিত সুখসায়ারে অশান্তির হলাহল উঠিল! স্নেহ ভালবাসার অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা দুটী তৃপ্ত ঘনিষ্ঠ প্রাণের মাঝখানে এই নিষ্ঠুর ব্যবধানের সৃষ্টি করিল কে ?

মণিকা একবার ভাবিল, "পিসীমা যে বলিলেন, সংসারে ঝগড়া ঝাঁটি কা'র না হয়, বাস্তবিক কথাটা তো মিথ্যা নহে,—কিন্তু এও কি সেই অতি সাধারণ দাম্পত্য কলহ মাত্র? - না আরও কিছু ? তাহাদের এই দিনে দিনে বৰ্দ্ধিত মনোমালিন্যের প্রকৃত কারণটা যে কি, না বুঝিলে সে প্রতিকার করে কেমন করিয়া? দূর হ'ক্ ছাই! মণিকার কেমন যে বদ্ অভ্যাস, মিছামিছি শুধু ভাবিয়া রাত জাগিয়া মরিতেছে! গিন্নিঝি ঠিকই বলিয়াছিল, দিদিমণির সকলতাতেই বাড়াবাড়ি!

স্বামী অল্পদিনের জন্য গিয়াছেন, আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, তা'র জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া এত অনর্থ বাধাইবার কি আবশ্যকতা ছিল? কিন্তু হায় রে নারী প্রকৃতি! মণিকার পোড়া মন যে কিছুতেই বোঝে না, কিছুতেই প্রবোধ মানিতে চাহে না!—কেবল মনে হয়, যেন তাহার জীবন সর্ব্বস্ব রুষ্ট অভিমানে তাহার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া আজ দূরে —অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে,—আর কি সে আসিবে? প্রেমে, আদরে, অনুরাগে ভরাইয়া দিয়া ব্যথিতা মর্ম্মপীড়িতার উচ্ছ্বসিত মরম বেদনা সে কি নিঃশেষে মুছাইয়া দিবে? দুশ্চিন্তার তীব্রদাহে কতক্ষণ যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগীর মত ছট্‌ফট করিয়া শেষে মণিকা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

তখন জাহ্নবীর পরপারবর্ত্তী দেবালয় হইতে দ্বিপ্রহরিক নহবতের

মধুর বেহাগ রাগিণী বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। পুনরায় চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ নীরব। শান্তিময়ী নৈশ প্রকৃতি সুপ্তিমগ্না শব্দ মাত্র হীনা।

নির্জ্জন কক্ষের একটী পাশে শয়ন করিয়া গিন্নিঝি গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। মণিকার বিবাহিত জীবনের সমগ্র সুখ সৌভাগ্যের সাক্ষী স্বরূপ সেই সুসজ্জিত ঘরখানি,—কত ভালবাসার মান অভিমান, কত প্রাণ গলানো, মন মাতান আদর সোহাগ, কত বিদায়ের ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস, বিরহের অশ্রু,—কত সুখমিলনের পরিপূর্ণ পুলকোচ্ছ্বাসের অম্লান স্মৃতি বক্ষে লইয়া যেন নীরবে জাগিয়া আছে!

সে কক্ষের প্রিয়-স্মৃতি সুরভিত বাতাসটুকুতেও যেন তাহাদের প্রথম পরিচয়ের সরম সঙ্কোচভরা অকথিত অস্ফুট মধুর প্রণয়বাণী,—উন্মেষিত নব জাগ্রত যৌবনের পরস্পর নিবিড়ভাবে সংবদ্ধ অভিন্ন হৃদয় দুটীর বাধাহীন, দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠিত আকুল প্রেমনিবেদন,—কত শত নিত্য নূতন আদর মাখা মিষ্ট প্রিয় সম্বোধনগুলি, তখনও ধ্বনিত হইতেছিল।

সে ঘরে আর কিছুতেই তিষ্ঠাইতে না পারিয়া, মণিকা তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল।

অন্ধকার ঘর আলোকিত করিয়া মণিকা একখানি বই সেলফ্ হইতে টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! পুস্তকের অক্ষরগুলি যেন সমস্ত জোট পাকাইয়া মণিকার চক্ষে একটা দুর্ব্বোধ্য হেঁয়ালীর মত জটিল হইয়া উঠিল।

বই রাখিয়া মণি রাইটীং টেবিলের কাছে গিয়া চিঠি লিখিবার প্যাড্ ও দোয়াত কলম লইয়া কি লিখিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দুই ছত্র

লিখিয়াই কি মনে করিয়া কাগজখানা কুট কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। হায়! তাহার গভীর ব্যথাভরা শান্তিহারা চিত্তের সান্ত্বনা আজ কোথায় মিটিবে?

বিনিদ্র যামিনীর শেষ যামটুকু কোনও মতে কাটাইয়া দিবার উপায় আর কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তাহার নিভৃত অবসরের সঙ্গী অর্গ্যাণের কাছে গিয়া বসিল। চিরপরিচিত কোমল করের স্পর্শ পাইয়া সেই নির্জীব বাদ্য যন্ত্র মধুর সুরবে বাজিয়া উঠিল। সেই সুরে মিষ্ট কণ্ঠ মিলাইয়া মণিকা মৃদু গুঞ্জন সুরে গাহিল—

আজি জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হ'তে ঘুম নিল হরি—
কে নিল হরি—মরি মরি!
যা'র লাগি ফিরি একা একা
আঁখি পিপাসিত,—নাহি দেখা
তারি বাঁশী ওগো। তারি বাঁশী
তারি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি—মরি মরি!

*　　　*　　　*

এই হিয়া ভরা বেদনাতে
বারি ছল ছল আঁখি পাতে
ছায়া দোলে—তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি—মরি মরি!

গাহিতে গাহিতে গায়িকার বিপর্য্যস্ত আকুল হিয়ার বেদনা তাহার আয়ত নয়নে ছাপাইয়া উঠিয়া যেন অশ্রুর আকারে ঝর ঝর ঝরিয়া

পড়িল। স্মৃতির ব্যথায় ব্যথিতা মণিকার মনে পড়িল এই গানটী সুধীরের কত প্রিয়, তাহার একান্ত আগ্রহে ও অনুরোধে পড়িয়া ইতিপূর্ব্বে মণিকাকে কতবার এই গানটী গাহিতে হইয়াছে, কিন্তু এমন মন প্রাণ দিয়া বুঝি সে আর কোনও দিন গাহিতে পারে নাই! বাজনা বন্ধ করিয়া দিয়া মণিকা ক্ষুদ্র বালিকার মত দুই হাতে মুখ চাপিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সেখানে কেহই ছিল না, শুধু মর্ম্ম-পীড়িতার বুকভরা ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করিতে বেহাগের মর্ম্মস্পর্শী মধুর তানের শেষ রেশটুকু সেই জনশূন্য স্তব্ধ কক্ষে ব্যাকুল আবেগে গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল।

অবসন্ন কাতর দেহ মন লইয়া একটুখানি শান্তির প্রত্যাশায় মণিকা যখন মুক্ত বাতায়ন তলে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

ঈষৎ নীলাভ পাণ্ডুর গগনের একটী প্রান্তে বিদায়োন্মুখ শুভ্র শুকতারাটী এক খণ্ড বড় হীরার মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। দেবমন্দিরে সানাইয়ের বাঁশীতে সুমধুর রাগিণী করুণ সুরেতে বাজিয়া উঠিয়া, দিকে দিকে রজনীর অবসানবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিতেছিল।

তাহারই ব্যথা ভরা উদাস প্রাণের আকুল উচ্ছ্বাসের মত সেই সুধাবর্ষী মধুময় বাঁশীর তানটুকু তন্ময় হইয়া শুনিতে শুনিতে মোহবিষ্টা মণিকার জাগরণ-ক্লান্ত জ্বালাময় চক্ষু দুটী ধীরে ধীরে অবসাদে মুদিয়া আসিল।

জানালার লৌহ গরাদে অবসাদ ক্লান্ত দেহভার এলাইয়া দিয়া চিন্তা-ক্লিষ্টা ব্যথিতা মণিকা শান্তিময়ী ঊষার স্নিগ্ধ ঝির্ ঝিরে বাতাসে অচিরেই তন্দ্রা ঘোরে আবিষ্ট হইয়া পড়িল।

পনেরো।

সুধীর চলিয়া যাইবার পর প্রায় সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত মণিকা তাহার একখানি পত্রও পায় নাই। তাহার সাদা প্রফুল্ল হাসিভরা সুন্দর মুখখানি হিম যামিনীর শীত-শীর্ণ-শিশির ঝরা বিবর্ণ গোলাপের মতই বিরস শ্রীহীন হইয়া উঠিতেছিল। যোগেশ্বর বাবু তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় জামাতার এই অপ্রিয় আচরণ ও বিরাগের প্রকৃত কারণ জানিতে না পারিয়া, মনে মনে বিলক্ষণ অধীর ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কন্যাকে এ বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে গেলে সে আনত আননে একই উত্তর দিয়া থাকে, "আমি তো জানি না বাবা!"

সুতরাং মনের অশান্তি মনেই রাখিয়া ভদ্রলোককে নিস্ফলতার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইত। সময় সময় তিনি ভাবিতেন পরের সন্তানকে আপন করিবার সমস্ত যত্ন ও প্রয়াস তাঁহার কি দৈব বিড়ম্বনায় ব্যর্থ হইয়া গেল? এতদিন কি বৃথাই মনে মনে দূরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া দুর্লভ পিতৃস্নেহ অপাত্রে ন্যস্ত করিয়াছেন! হায় নিয়তি! তোমার বিধান যে অলঙ্ঘ্যনীয়!

বৈকালে মণিকা তাহাদের অন্তঃপুর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে একখানি ম্লান ছায়ার মত ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অস্তগমনোন্মুখ শ্রান্ত তপনের লোহিত রাগে রঞ্জিত রক্ত কিরণ-রেখা মণিকার ম্রিয়মান সুন্দর মুখখানিতে পতিত হইয়া প্রিয় বিরহ

দুঃখে কাতরা প্রেমময়ী সূর্য্যমুখীর মত মধুর সকরুণ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেছিল।

আন্‌মনা মণিকা সহসা পশ্চাতে কাহার সতর্ক পাদবিক্ষেপের শব্দ শুনিতে পাইয়া একটা অনিশ্চিত আশায় লুব্ধ হইয়া সচকিতে ফিরিয়া দেখিল, তাহার প্রিয়সখী দীপ্তি পা টিপিয়া তাহারই দিকে আসিতেছে। সইকে দেখিয়া বিষণ্ণ মুখে জোর করিয়া হাসি ফুটাইয়া মণিকা বলিল, "ওঃ! কি ভাগ্যি! আজ কা'র মুখ দেখে উঠেছিলুম সই?"

"তা'তো জানি না, তবে আমি আজ কা'র মুখ দেখে উঠেছি, তা ঠিক বলে দিতে পারি--"

মণিকার উদাস মূর্ত্তির দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দীপ্তি হাস্য রঞ্জিত অধরে বলিল, "তোকে বিরহিনী বেশে কেমন দেখায় আজ তা'ই দেখতে এলুম সই, কিন্তু এতখানি আশা করিনি অবশ্য, এ যে একেবারে বিরহের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখালি ভাই!"

মণিকার এলায়িত মুক্তকেশ ভার আন্দোলিত করিয়া দীপ্তি চুপি চুপি গাহিল, "এ সুখ বসন্তে সই! কেন লো এমন আপন হারা, বিবশা আহা মরি! কুন্তল আলু থালু এলায়ে কপোল পরি—"

সখীর রঙ্গোজ্জ্বল মুখখানির পানে একটা কটাক্ষ হানিয়া মণিকা সহাস্যে কহিল, "মরণ আর কি! কাটফাটা গরমে মানুষের প্রাণ বেরুচ্ছে, এ সময় আবার বসন্ত কোথায় পেলি?"

মুচ্‌কি হাসিয়া দীপ্তি বলিল, "কেন সই! যা'র প্রাণে সুখ আছে, তা'র কাছে যে চিরবসন্ত বাঁধা আছে! কিন্তু তুমি কি আশ্চর্য্য মেয়ে

ভাই! সুধীর বাবু এই তো সে দিন গিয়েছেন, এরি মধ্যে এমন সর্ব্বত্যাগিনী বিবাগিনী হয়ে বসেছিস্!"

দীপ্তির নরম গাল দুটী আদরে টিপিয়া দিয়া মণিকা বলিল, "সব শেয়ালের এক বুলি! খাওয়া, শোওয়া, ঘুমনো, সবই তো রীতিমত চলছে, তবে ত্যাগটা যে কিসের করলুম, তা'তো বুঝতে পারি না! পিসীমা বুঝি তোদের কাছেও লাগিয়েছেন?"

"লাগাতে হবে না, মুখ দেখেই যে তোর অবস্থা বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

মণিকা আর গোপন করিবার আশা ত্যাগ করিয়া দীপ্তির গলা জড়াইয়া ধরিয়া সখেদে বলিল, "আচ্ছা সই! তুইই ধর্ম্মতঃ বল তো, এ রকম ছন্নছাড়া ভাবে থাক্‌তে কারও কি ভাল লাগে,? মনে কর, ধীরেনবাবু যদি ঝগড়া বিবাদ করে চলে যান তা'হলে—"

বাধা দিয়া দীপ্তি মৃদু হাসিয়া বলিল, "ওঃ! সে দিকে কসুর নেই ভাই, আমাদের ঠোকাঠুকি তো নিত্যই লেগে আছে, কিন্তু তা'র জন্যে চলে টলে যাওয়ার কোনও লক্ষণ তো আজ অবধি দেখা গেল না—"

সখীর অসঙ্গত বাক্যে বিলক্ষণ বিস্মিত হইয়া, মণিকা ব্যগ্র কৌতূহলের সহিত বলিয়া উঠিল, "এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা সই! ধীরেন বাবু চলে গেলে তো'র কি মনে দুঃখ হবে না? তখন যে কেঁদে মরবি!"

দীপ্তির হাসিমুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দুঃখ যে হবে না তা বলছি না, কিন্তু—"

তাহাকে থামিতে দেখিয়া মণিকা একটা ঠেলা দিয়া সাগ্রহে বলিল, "কিন্তু কি বল্ না?"

দীপ্তি মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার আভাস জাগাইয়া ধীরে ধীরে

বলিতে লাগিল, "আমার কি মনে হয় জানিস্ ভাই! ও যদি এমনধারা শ্বশুরের অন্নদাস হয়ে না থেকে, কোনও দূর বিদেশে গিয়েও স্বাধীন ভাবে থাক্‌তে পারে, তা'হলে বোধ হয় আমি এর চেয়ে বেশী সুখী হই, আর ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ওর বিচ্ছেদ যন্ত্রণাও হাসিমুখে সহ্য কর্‌তে পারি---"

হায় রে স্বাধীনতা! তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! এই পোড়া স্বাধীনতার মোহে ভুলিয়াই না মণিকার জীবন সর্ব্বস্ব রাজসুখ ভোগেও তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না? নতুবা এ সংসারে তাঁহার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব! মণিকা উন্মনা হইয়া ছল ছল চক্ষে বলিল, "কি জানি ভাই, আমার তো এ রকম মনে হয় না। তবে ওর মনে হয় তো এই রকমই একটা ভুল ধারণা আছে, তা'ই মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা দরকার সমস্ত পেয়েও সুখী হতে পারছেন না।"

দীপ্তি মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভুল ধারণা নয় ভাই, মানুষটার মধ্যে সত্যিকারের মনুষ্যত্ব আছে বলেই এ কথাটা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু আমার ওনার সে সব বালাই নেই, তাই নির্ব্বিকার হয়ে—"

বিদ্রূপের সুরে মণিকা বলিল, "দূর হ পাপিষ্ঠা! গুরু নিন্দে করছিস? এই বুঝি তোর পতি ভক্তি?"

দীপ্তি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "নিন্দে করি কি সাধে ভাই? তোর যেন বাবা বড়লোক, ঘরে আর কেউ বলবার কইবার নেই, তোর কথা ছেড়ে দে, কিন্তু আমাদের মতন গেরস্ত ঘরে ঘরজামাইয়ের স্ত্রী হওয়া যে কি কর্ম্মভোগ, তা যে ভুক্তভোগী, সেই জানে। কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অপমান বোধ, পান থেকে চূণ খস্‌বার যো নেই। ওদিকে

কর্ত্তাটীর মন রাখতে গেলে আবার বাড়ীর আর সবাই ব্যাজার হয়, এ যেন ঠিক দুনৌকোয় পা দিয়ে চলা। বাস্তবিক এ ভাবে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগে না, এমন মিলন সুখের চেয়ে বিরহ যে ঢের ভাল ভাই!"

সরলপ্রাণা দীপ্তির এই স্পষ্ট আক্ষেপোক্তি মণিকার চিত্ত স্পর্শ করিল। একটা নূতন অনুভূতি প্রাণে অলক্ষ্যে জাগিয়া উঠিয়া আজ যেন তাহাকে জানাইয়া দিল যে, এইরূপ একটা অশান্তি ও অস্বস্তির ভাব তাহার মনের কোণেও সম্প্রতি উঁকি ঝুঁকি মারিতে আরম্ভ করিয়াছে। মণিকা অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যাক ভাই এখন এ সব কথা যেতে দে। যা'র ভাগ্যে যা লেখা আছে, তা তো কেউ খণ্ডন করতে পারবে না? এখন চল দেখি ঘরে, তোকে একটা নতুন জিনিষ দেখাব।"

"কি জিনিষ ভাই? বরের চিঠি বুঝি?"

"হুঁ, চিঠি দেবার জন্যে তা'র তো ভারি মাথা ব্যথা, পড়ে গিয়েছে।" হ্যাঁ রে মাসীমা কোথায়?"

"মা পিসীমার কাছে গল্প করছেন, চল্ না কি দেখাবি তাই দেখা।"

মহামায়া তাঁহার কক্ষে বসিয়া দীপ্তির মার সঙ্গে সংসারের সুখ দুঃখের ও ঘরকন্নার বিষয়ে গল্প করিতেছিলেন। কাছেই গিন্নিঝি পা ছড়াইয়া বসিয়া পান সাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে সেই গল্পে যোগ দিতেছিল। কথায় কথায় দীপ্তির মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাগা দিদি! জামাই যে এখনো ফিরলেন না? বাড়ীতে কাজকর্ম্ম আছে বুঝি?"

মহামায়া ঠোঁট বাঁকাইয়া অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "কাজকর্ম্ম ছাই! বসে বসে ঐ একটা খেয়াল চাপ্‌ল আর কি? কবে আসবে তাও তো

জানি না, এদিকে মেয়েটা একেবারেই মনমরা হয়ে রয়েছে, বিয়ে হয়ে এস্তক এ রকম ছাড়াছাড়ি তো কখনও হয়নি?"

গিন্নিঝি একটা পানের খিলি দীপ্তির মা'র হাতে দিয়া আর একটা নিজের মুখে আল্‌গোছে টপ্ করিয়া ফেলিয়া সহানুভূতির ভাবে বলিল, "তা আর বলতে? আহা গো! দুটীতে যেন যোটের পায়রা! রাতদিন চোখে চোখে মুখে মুখে বসে আছে, জামাই বাবু এবার যে কি করে এদ্দিন রয়েছেন, তা বল্‌তে পারি না, দিদিমণির তো মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। কিন্তু তাও বলি মা! আমাদের মেয়েটীরও একটু দোষ আছে,— সকল সময় জোড়হাত একেবারে তটস্থ থাকা, অত খোসামোদ কেন রে বাপু? অত "নাই" দিলে সব পুরুষ মানুষেরই মাথা বিগড়ে যায়। যা রয় সয় তা'ই না ভাল। তা দিদিমণিকে বলে কে এ কথা? একটু কিছু আভাস দিলেই অমনি মেয়ে রাগ করে খাবে না, শোবে না, চুল বাঁধবে না, সে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড!"

দীপ্তির মা তা'র কথায় সায় দিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিল, "আহা বলো না গিন্নিদিদি! একালের মেয়েগুলোর ধারাই ঐ, সকলতাতেই আদিখ্যেতা। তা'র ওপর আমাদের যা অবস্থা তা তো তোমরা জানই! জামাই ঘরে পুষে বারমাস তিরিশ দিন ঠাকুর সেবা করা আমাদের মত লোকের পোষায় কি? যতদূর সাধ্যি করছি, তবু একটুখানি কিছু ত্রুটী হলেই অমনি জামাইয়ের মুখ অন্ধকার, মেয়ের মন ভার হবে, ভাল মুখে কথা বলবে না, অভিমানে না খেয়ে শুকিয়ে থাক্‌বে। ঘরজামাই রাখার যে এত জ্বালা, তা আগে জান্‌লে কর্ত্তাকে কখনই এমন কাজ করতে দিতুম না।"

মহামায়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "সত্যি ভাই, 'জন, জামাই, ভাগ্না এ তিন না হয় আপনা,' কথাটা যে বলেছে, সে বড় দুঃখেই বলেছে। আমাদের যোগুর কত সাধের হারামরার ঐ একটা মেয়ে, এক চক্ষু, ওকে ছেড়ে থাক্‌তে পারবে না বলেই ত ঘরজামাই করেছিল, কিন্তু এত যত্ন আদরেও তো ছেলের মন ওঠে না, ছুতোয় নাতায় থেকে থেকে নড় বল্‌তেই বাড়ী যাওয়া, দিনের দিন ডানা বেরুচ্ছে কি না!—আর ধরা বাঁধায় থাক্‌বে কেন?"

মহামায়ার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া গিন্নিঝি চিবাইয়া চিবাইয়া, বলিতে লাগিল, "তুমি কিচ্ছু ভেব না মা, কিচ্ছু ভেব না, এমন রাজ্যরাজত্বি ছেড়ে জামাই বাবু যাবেন কোথায়? এত সব আয়েস আয়াস ফেলে থাক্‌তে পারলে তো কোথাও থাক্‌বেন? হুঁ, তুমি দেখো মা! দেখো, বাড়ী যাওয়ার সাধ দুদিনেই মিটে যাবে, তখন ছুটে আসতে পথ পাবেন না—।"

ঠিক সেই সময় পাশের ঘরের মাঝামাঝি দরজার কাছে কিসের একটা শব্দ হইল। মহামায়া গিন্নিঝিকে বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ্‌তো নিস্তার, ওরা দুজন কোথায় গেল, ডেকে দে একবারটী, খাবার টাবার দিই, ওর সঙ্গে মণিটাও যদি একটু কিছু খায়, মেয়ের খাওয়া টাওয়া তো সব গেছে। কোনও কিছুরি হুঁস নেই!"

গিন্নিঝি যাইবার পরক্ষণেই মণিকা সখীর হাত ধরিয়া আসিয়া বলিল, "মাসীমার কাছে আমার নিন্দে করছিলে বুঝি পিসীমা!"

দীপ্তির মা মণির শুষ্ক পরিম্লান মুখখানির দিকে চাহিয়া, সস্নেহ সহানুভূতির সহিত বলিলেন, "পিসীমা তো মিথ্যে কিছু বলেননি মা! মুখখানি

যে এতটুকু হয়ে গেছে! আহা মা, এমনি করেই কিশরীরে অযত্ন হেনস্তা করতে হয়? এস, একটু জলটল খেয়ে দীপীর কাছে চুল গাছটা বেঁধে ফেলতো, লক্ষ্মী মা আমার!"

এমন সময় গিন্নিঝি ফিরিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "ওগো শুনছ! জামাই বাবু এসেছেন—"

মণিকা ছাড়া সবাই একবাক্যে বলিয়া উঠিল,"এসেছে? সত্যি? ওমা এমন হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে কয়ে—"

গিন্নিঝি মিশিরঞ্জিত দাঁতের শোভা বিকশিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বলা কওয়া কি? আমি তো মিথ্যে বলিনি—না এসে আর যাবেন কোথায়? যাও না গো দিদিমণি! চুপ করে ভাব্‌ছ কি?— তোমাকে যে ডাক্‌ছেন।" মণিকা মনের ব্যাকুল আগ্রহ সত্ত্বেও লজ্জায় পা বাড়াইতে পারিতেছিল না। মহামায়া ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "যা মা, শীগগির গিয়ে দেখ, কি চাই। আমি দীপ্তিকে ততক্ষণ খাবার দিচ্ছি। জামাইয়ের মুখহাত ধোয়া হলে বলো, তাকেও জল খাবার দেব!"

গমনোদ্যতা মণিকার লজ্জারুণ সুন্দর মুখের পানে রঙ্গভরা চপল কটাক্ষ হানিয়া দীপ্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমাব আসার কিন্তু পয় আছে বাপু!"

ষোল।

সুধীরের চিত্তবল যথেষ্ট থাকিলেও দীর্ঘদিনের অভ্যাস তাহাকে এতই বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, যে শ্বশুর গৃহের না চাহিতে পাওয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ফেলিয়া সে অধিক দিন বাড়ীতে টিঁকিয়া থাকিতে পারিল না। বিশেষতঃ সরলা পতিগতপ্রাণা মণিকার একনিষ্ঠ পবিত্র প্রেম তাহাকে অবিরত প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছিল। তাই বুকভরা অধীর ব্যাকুলতা লইয়া সে পুনর্ম্মিলন আশায় মণিকার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। বিধি বিড়ম্বনায় সুধীরের হরিষে বিষাদ ঘটিল।

ব্যগ্র আগ্রহে মণিকে ডাকিতে পিসীমার ঘরের দিকে পদার্পণ করিতেই নিজের সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে পাইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। যাহা শুনিল, তাহাতে তড়িৎ স্পৃষ্টের মত সুধীরের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

হায় অদৃষ্ট! এ সংসারে তাহার স্থান কি এতই নিম্নস্তরে,—সে কি এতই তুচ্ছ এতই হেয়, যে সামান্য দাস দাসীতেও কর্ত্রীর সম্মুখে তাহার সম্বন্ধে এমন সব লজ্জাজনক আলোচনা করিতে সাহস পায়? ছি! ছি! ধিক্ শতধিক্ তাহার এই ঘৃণিত জীবনে!

ভগবান তাহাকে জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা সমস্তই তো যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছেন, তবে এমন হীনতা ও অপমান সে কেন সাধ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতেছে? ঈশ্বরদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করিয়াও সে কেন তাহার অপলাপ করিতেছে?

কষ্টে আত্মদমন করিয়া সুধীর মাতালের মত টলমল স্খলিত চরণে নিজের ঘরের দিকে ফিরিল। মাঝপথে গিন্নিঝির সহিত সাক্ষাৎ। গিন্নিঝি সুধীরকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "ওমা! জামাই বাবু যে! কখন্ এলেন গো?" জামাই বাবুকে নিরুত্তরে ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া সে "যাই বাপু! দিদিমণিকে বলি গে, বেচারি ভেবে সারা হচ্ছে—" বলিয়া মণিকার উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার ঠোঁটের কোণের প্রচ্ছন্ন ক্রূর হাসিটুকু সুধীরের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

দীপ্তির কাছে বিদায় লইয়া মণিকা কম্পিত চরণে স্পন্দিত বক্ষে যখন স্বামী সম্ভাষণে আসিল, তখন সুধীর মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার মুখে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল। প্রিয়তমাকে সম্মুখাগত দেখিয়াও সে মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য বা উচ্ছ্বাস জাগিতে দেখা গেল না। স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া মণিকা শঙ্কিত চিত্তে তাড়াতাড়ি কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গো? সেখানে সব ভাল তো? গিয়ে পর্য্যন্ত একখানি চিঠিও দেওনি আমি ভেবে মরছিলুম—"

তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠের প্রশ্নগুলির মধ্যে একটীরও উত্তর না দিয়া সুধীর বজ্রগর্ভ বারিদের মত তীব্র গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "মণি!"

ভয় পাইয়া মণি ত্রস্তে বলিল, "কি বলছ?"

সুধীর সেই স্বরে বলিল, "তুমি এখানে থাকৃতে চাও, না আমাকে চাও, তা ঠিক করে বল মণি!—আশা করি আমার সাম্‌নে তুমি মিছে কথা বলবে না—"

সুধীরের এই অভাবনীয় কঠোর প্রশ্ন মণিকাকে যেন বিনামেঘে অশনিপাতের মতই বিস্মিত বিমূঢ় করিয়া তুলিল। স্বামীর অকস্মাৎ এই

বিরাগের কারণ জানিতে না পারিয়া সে কম্পিত দুরু দুরু বক্ষে জড়িত রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল, "কি চাই আমি, তাও কি আজ মুখে বলে জানাতে হবে গো? তুমি কি জান না, আমি আর কিছু চাই না জগতের, শুধু চাই তোমাকে?—কিন্তু একথা যে কেন জিজ্ঞাসা করছ তুমি তাও যে বুঝতে পারছি না—"

"বুঝে আর দরকার নেই—তবে তুমি যদি সত্যিই আমাকে চাও, আমাকে আন্তরিক ভালবাস, তা'হলে আমার সঙ্গে চল আজই—"

"আজই? কোথায়—কোথায় যেতে হবে?"

"যেখানে আমি নিয়ে যাই,—যাবে না?"

মণিকা বিপন্ন আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ যাব, হাত ধরে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেইখানেই যেতে প্রস্তুত—কিন্তু বাবা,—তাঁ'কে একবারটি জিজ্ঞাসাও করবে না কি?"

"হ্যাঁ, তাঁকে একবার জানাব নিশ্চয়, কিন্তু অনুমতি চাইতে আর পারব না মণি,—চাইলেও তা পাব না, নিশ্চয় জেনো।"

মণিকা সজল চক্ষে কাতর মিনতির স্বরে বলিল "তবু একবারটী বলেই দেখ না,—বেশ করে বুঝিয়ে, ওগো! তোমার দুটী পায়ে পড়ি—বাবার সঙ্গে মনান্তর করো না,—আমরা ছাড়া, তাঁ'র যে আর কেউ নেই, কোনই অবলম্বন নেই জগতে—"

মণিকা অধীর হইয়া যথার্থই স্বামীর পায়ের উপর মাথা রাখিল।

অনুতপ্ত সুধীর পদলুণ্ঠিতাকে পরম আদরে বক্ষে তুলিয়া লইল। বর্ষার গোলাপ যেমন একটুখানি নাড়া পাইলেই তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সঞ্চিত বারিবিন্দুগুলি নিঃশেষে ঢালিয়া দেয়, তেমনি ব্যথিতা মণিকার

এতদিনের রুদ্ধ অভিমান ও আঘাতের বেদনা স্বামীর ঐটুকু আদর স্পর্শে গলিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষের উপর ঝরিয়া পড়িল।

সুধীর দ্বিগুণ ব্যথিত হইয়া বলিল, "তুমি যদি দুঃখ পাও মণি, থাক এখন বাবার কাছে, আমি একলাই যাই, তারপর ভগবান যদি দিন দেন, তা'হলে একটা কিছু সুবিধে করেই তোমাকে নিয়ে যাব।"

কেন যাইবে, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই মণিকা ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া শশব্যস্তে কহিল, "না না, তুমি একলা যেও না, আমাকে ছেড়ে যেওনা—আমি তা'হলে একদণ্ডও থাকতে পারবো না—নেহাত যাবে যদি আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

"কিন্তু বেশ করে ভেবে দেখ মণি,—আমাদের বাড়ীর অবস্থা তো জানই—সেখানে অত কষ্ট সহ্য করে থাকতে পারবে কি তুমি? ভাল করে বুঝে নাও, সব। নাঃ! রাগের মাথায় কথাটা তোমায় বলে ফেলে ভাল করলুম না আমি,— চুপি চুপি চলে গেলেই হ'ত!"

ভীতা মণিকা সুধীরকে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "অমন কথা বলো না গো বলো না!—তোমার সঙ্গে যেখানে যেমন ভাবেই থাকি, আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না,—সত্যি বলছি—আমাকে নিয়ে চল তুমি।"

সুধীর চিন্তান্বিত উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, "তা'হলে কর্ত্তাকে একবার বলেই দেখি—কিন্তু উনি যদি রাজি না হন তোমাকে পাঠাতে তা'হলে—"

মণিকা অশ্রুভারাকুল নেত্রে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তা হলেও আমাকে যেতেই হবে যে!—কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি করছ কেন? আজকের

দিনটা থেকে কাল গেলেই তো ভাল হয়। এখন আর গাড়ীর সময়ও নেইতো”—

“না মণি, আমাকে তুমি মাপ করো, আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকৃতে ইচ্ছুক নই। গাড়ীর সময় নাই থাক্, নৌকায় যাব—গাজিপুর কতটুকুই বা পথ, জ্যোৎস্না রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ যাওয়া যাবে।”

যোগেশ্বর তাঁহার আফিস ঘরে বসিয়া কোনও মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন, সুধীর নিঃশব্দে গিয়া প্রণাম করিল। জামাতাকে দেখিয়া যোগেশ্বর আনন্দিত হইয়া কহিলেন, “এই যে সুধীর কখন এলে বাবা?”

“আজ্ঞে, এই অল্পক্ষণ হ’ল, কিন্তু—”

“কিন্তু কি বসো না। জলটল খাওয়া হয়েছে তো?”

সুধীর বসিল না। সে গলার স্বর পরিষ্কার করিয়া অসঙ্কোচে কহিল, “কোনও কারণে আমি আবার আজিই ফিরে যেতে চাই - ”

জামাতার মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া যোগেশ্বর বিস্ময়াপন্ন ও কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আজই ফিরে যাবে?—সে কি কথা? কারণটা কি জান্‌তে পারি না?”

সুধীর অধোমুখে খানিক নীরব থাকিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিল, “বসে আর ভাল লাগঁছে না, তা’ই একটা কোনও কাজ কর্ম্মের চেষ্টা—”

“বল কি? তোমাদের রেজল্ট তো শীগ্‌গির বেরুবে শুন্‌ছি,—আর তুমি পাশ হবে নিশ্চয়,—তারপর সোজা এম্ এ পড়বে, এই তো ঠিক করা আছে, এর মধ্যে আবার ও সব অনাসৃষ্টি ভাবনা তোমার মাথায় ঢুকল কেমন করে?”

সুধীর নতনেত্রেই ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "আজ্ঞে, আমি আর পড়ব না মনে করছি।"

"কেন!"

উত্তর প্রত্যাশায় যোগেশ্বর রুদ্ধশ্বাসে সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুধীর অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া জানাইল পড়িতে ইচ্ছা নাই।

যোগেশ্বর একটা আশাভঙ্গ জনিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বেশ, তা'হলে নিজের বিষয় আশয় তদারক কর, সেও তো একটা মস্ত কাজ! আমি একা আর কাঁহাঁতক দেখ্‌ব?—এতদিন হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খেটে এত করে মরলুম, শুধু তোমাদের জন্যেই তো?—আর আমার আছেই বা কে?"

শেষের দিকে যোগেশ্বর বাবুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, তাঁহার আন্তরিকতা পূর্ণ সস্নেহ বচনে সুধীরের অশান্ত মন অনেকটা নম্র হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু চকিতে মনে পড়িল, সেই ক্ষণ পূর্ব্বের অতর্কিতে পাওয়া দারুণ অবমাননার কথা, চিত্তের দুর্ব্বলতাটুকু সবলে ঠেলিয়া দিয়া সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "বিশেষ কারণে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যেও আমাকে যেতে হচ্ছে, না গিয়ে উপায় নেই—"

জামাতার সেই অবিচল দর্পিত বাক্যে এবার রুষ্ট হইয়া যোগেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সক্রোধে বলিলেন, "তুমি তো ভারি জেদী ছোক্‌রা হে! যাবে যদি তবে এলে কেন?"

সুধীর কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিনীতভাবে কহিল, "আমি আমার স্ত্রীকেও নিয়ে যেতে চাই—"

অতিমাত্র বিস্ময়ে চমকিত হইয়া দুটী চক্ষু কপালে তুলিয়া যোগেশ্বর অধীর কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "বল কি? আমার মেয়েকে তুমি আমার অমতে নিয়ে যাবে,—আস্পর্দ্ধা তো কম নয় তোমার!"

অতঃপর সুধীরের ধৈর্য্যরক্ষা কঠিন হইয়া পড়িল। তাহার শান্ত নম্র মুখমণ্ডলে দৃপ্ত বিদ্রোহের ভাব বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিল। উত্তেজিত তীব্রস্বরে সে বলিল, "আমার স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাব,—এতে আর আস্পর্দ্ধা দেখান হ'ল কিসের? বিশেষতঃ সে নিজেই যেতে ইচ্ছুক যখন—"

বাধা দিয়া যোগেশ্বর রোষক্ষুব্ধ তর্জ্জন স্বরে বলিলেন, "কক্ষণো নয়! এ হ'তেই পারে না,—সে ছেলে মানুষ, নিজের ভাল মন্দ বোঝে কি? তুমি যেমন ভজিয়েছ তেমনি বলছে। কিন্তু উঃ! তুমি যে এতদুর অকৃতজ্ঞ হ'তে পার, এ যে আমার ধারণার অতীত!—এখন বুঝলুম, আমি এতদিন দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি—"। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে অধীর হইয়া যোগেশ্বর বাবু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

সুধীর রোষে, অভিমানে, অপমানে মুখ লাল করিয়া সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল "তা হলে আপনার মেয়েকে না পাঠানই কি আপনার অভিমত?"

"নিশ্চয়! এ কথা কি আবার বলে জানাতে হবে? আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তুমি রাখ্‌বে কোথায় শুনি?—তুমি মামার বাড়ী—মামার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছ বলে আমার মেয়ে সেখানে তাঁদের দাসীবৃত্তি করতে যেতে পারে না তো? সব জেনে শুনে মেয়েটাকে তোমাদের হাতে জবাই করতে দিতে আমি বাপ হয়ে কেমন করে পারি বল?"

সুধীর শেষ আশায় নির্ভর করিয়া আবার বলিল "তা হলে আমি যেতে পারি ?—ওকে আপনি কখনই পাঠাবেন না ?"

"না না—এ জন্মে নয় !—তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পার। তোমার মত অবাধ্য নিমকহারামকে ধরে রাখ্‌তে আমি চাই না !"

"বেশ তা হলে আমি চল্লুম,—আপনার মেয়েকে যতদিন ইচ্ছে আশ মিটিয়ে কাছে রাখুন আপনি। কিন্তু আমি যদি কোনও দিন ভুলেও আর এ মুখো হই—তা হলে—"

সুধীর রাগের মাথায় একটা কঠিন শপথবাক্য উচ্চারণ করিয়া ফেলিল।

তাহার তেজ ও স্পর্দ্ধায় বিস্মিত হইয়া যোগেশ্বর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বেশ কথা, যাও তুমি এখনি দূর হয়ে যাও—আমিও আর কোনও দিন তোমার মুখ দেখ্‌তে চাই না।"

"শুনে সুখী হলুম"—অপমানহত ক্রুদ্ধ সুধীর আরক্ত মুখে গট্‌ গট্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

হতবুদ্ধি, হতবাক্‌ যোগেশ্বর বজ্রাহতের মত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। হা ভগবান্‌! সন্তান দিয়াছিলে যদি, তবে কন্যাসন্তান দিলেন কেন ? অভাগার সর্ব্বহারা রিক্ত জীবনের ঐ এতটুকু সান্ত্বনা, অন্ধের যষ্টি, বার্দ্ধক্যের সম্বল,—নিজের সুখ দুঃখ, মান অপমান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও উহাকে সুখী করিতে পারিলেন না ! এ দুঃখ, এ ক্ষোভ যে মরিলেও যাইবার নহে !

সেই সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল পিসীমা ডাকিতেছেন। একটা মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া যোগেশ্বর বাবু অন্তঃপুরের দিকে অবসন্ন মন্থর গতিতে চলিলেন।

সতের।

মণিকা উদ্বেগে ব্যাকুল হইয়া অধীর চিত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুধীরের অস্থির চলনভঙ্গী ও প্রলয়বর্ষী মেঘের মত সুগম্ভীর অপ্রসন্ন মুখশ্রীর দিকে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াই সে বুঝিল দুর্য্যোগ অবশ্যম্ভাবী।

একটা অনিবার্য্য অমঙ্গল আশঙ্কায় সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া শুষ্ক মুখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হল? বাবা—বুঝি রাজি হলেন না?"

সুধীর তীব্র আহত কণ্ঠে বলিল, "সে তো জানাই ছিল! তবে অদৃষ্টে নাকি আরও কতকগুলো লাঞ্ছনা অপমান বাকি ছিল তাই মরতে গিয়েছিলুম—"

মণিকা ত্রস্তে স্বামীর কাছ ঘেঁসিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "তা হলে কি হবে এখন তুমি কি করবে—"

পত্নীর ব্যাকুলতায় দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া সুধীর তাহার সঙ্গে আনীত জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "কি আর হবে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব—"

"আমাকে নিয়ে যাবে না?"

"না, তোমার বাবা বলছেন আমি তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—"

কাতর বিবর্ণ মুখে, অশ্রুভরা আর্ত্ত নয়ন দুটী স্বামীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া মণিকা ত্রস্ত করুণ স্বরে বলিল, "কিন্তু আমি তো তোমার

কাছে কোনও দোষ করিনি, আমাকে কোন্ অপরাধে ফেলে যেতে চাও তুমি ?"

সুধীর কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, "আমার সঙ্গে যেতে চাও চল, কিন্তু আমি আর দেরি করতে পারব না তা বলে দিচ্ছি।"

"আচ্ছা, আর একটু,—একটুখানি থামো, আমি একবার বাবার পায়ের ধূলো নিয়ে আসি।" অশ্রু জড়িত কাতর কণ্ঠে কথা কয়টী বলিয়া মণিকা বুকের ভিতরকার ঝড় কষ্টে চাপিয়া রাখিয়া স্নেহময় পিতার কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে গেল।

তখন জামাতার উদ্ধত আচরণে মর্ম্মাহত যোগেশ্বর ভগিনীর কাছে বসিয়া তাহারই কথা বলিতেছিলেন। সঙ্কুচিতা বেপমানা মণিকা পিতার চরণে মাথা লুটাইয়া সকরুণ আর্দ্র কণ্ঠে ডাকিল "বাবা!"

"কেন মা? কি হয়েছে লক্ষ্মী আমার?" বিস্ময়ে শঙ্কায় অধীর ব্যাকুল হইয়া যোগেশ্বর অবলুণ্ঠিত কন্যাকে তুলিতে চেষ্টা করিলেন।

মণিকা অশ্রুপ্লাবিত কাতর মুখখানি পিতার দিকে তুলিয়া, করযোড়ে মিনতিপূর্ণ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল "আমি চল্লুম বাবা,—যদি পারো তোমার এ অকৃতজ্ঞ অবাধ্য সন্তানকে ক্ষমা করো,—তার এ জ্ঞানকৃত অপরাধ ভুলে আশীর্ব্বাদ কর,—যেন তার দুর্ভাগ্য জীবনের সব দুঃখ সমস্ত লাঞ্ছনা সে হাসি মুখে বুক পেতে গ্রহণ করতে পারে। তোমার এ প্রাণ ঢালা অযাচিত স্নেহের প্রতিদানে বুক ভাঙ্গা আঘাত দিয়ে শুধু তোমার অভিসম্পাত নিয়েই যেন না যেতে হয় তাকে—"

মণিকা আর বলিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে, ও উদ্গত অশ্রুধারায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

স্তম্ভিত, হতবাক্ যোগেশ্বর বাবু রোরুদ্যমানা স্নেহের প্রতিমাটীকে বক্ষে জড়াইয়া উন্মাদের মত হাহাকার করিয়া উঠিলেন, "তোকে এত করেও ধরে রাখ্‌তে পারলুম না মা!—আমাকে ছেড়ে সত্যি সত্যি চল্লি? কিন্তু অসহায় বুড়ো বাপের মায়া কাটিয়ে যেতে পারবি তো মা?"

ব্যথাবিধুর পিতার ঘনস্পন্দিত উদ্বেলিত বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মণিকা কান্না ভাঙ্গা আকুল স্বরে বলিল, "কি করব বাবা, আমাকে যে যেতেই হবে,—ছোট বেলা থেকে তোমার মেয়েকে যে পথে চলতে শিখিয়েছ, সে পথে না গিয়ে তা'র উপায় নেই যে বাবা!"

দুঃখে ক্ষোভে, বেদনার আতিশয্যে যোগেশ্বরের শুষ্ক কণ্ঠ তালু হইতে একটীও শব্দ বহির্গত হইল না, শুধু চক্ষু ফাটিয়া উত্তপ্ত অনর্গল অশ্রুধারা স্নেহমথিত পিতৃহৃদয়নিঃসৃত উৎসারিত কল্যাণ আশীষ ধারার মতই ব্যথা-হতা মণিকার মাথার উপর টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

মহামায়া সরোদনে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও রে দয়া মায়া ভুলে একেবারে পাষাণী হয়ে যাস্‌নে রে,—তোকে হারিয়ে ও যে পাগল হয়ে যাবে!"

মণিকা মুখে আঁচল চাপা দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ রোধ করিতে করিতে পিসীমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কষ্টে উচ্চারিত করিল, "আমার বাবাকে তুমি দেখ পিসীমা! আমার যে ফেরবার উপায় নেই!"

চির স্নেহময় পিতার মমতা কোমল বক্ষে মর্ম্মভেদী নির্ম্মম শেলাঘাত করিয়া, মাতৃস্থানীয়া পিসীমাকে চক্ষের জলে ভাসাইয়া, আবাল্যের সুখ দুঃখের সহস্র স্মৃতি বিজড়িত বড় সাধের পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া

মণিকা যখন স্বামীর সহিত নৌকায় গিয়া উঠিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ প্রায়।

শুক্লা দশমীর নবোদিত তরুণ চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হইয়া গঙ্গার সুদূর প্রসারিত সুগভীর শান্ত বারিরাশি, গলান হীরার মত ঝল্‌মল্ টল্‌মল্ করিতেছিল।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল তরঙ্গগুলি জ্যোৎস্নার শুভ্র মুকুট মাথায় দিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে যেন কোন্ সুদূর স্বপ্ন-লোকের পুলকবার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছিল।

সেই রূপালী আলোয় ভরা শুভ্র নিথর জ্যোৎস্না সাগর আলোড়িত করিয়া ক্ষুদ্র তরণীখানি, ব্যথিতা মণিকাকে তাহার পিতার নিরাপদ সুখময় স্নেহনীড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া ছল্ ছল্ ছলাৎ করিয়া,— ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিল।

পরপারে রামনগরের সীমান্তবর্ত্তী স্বপ্ন দৃষ্ট কল্পনালোকের মত অস্পষ্ট দৃশ্যগুলি ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল এবং এ পারের ঘাটের কোলাহল ক্রমে নিস্তব্ধ ও তীরবর্ত্তী দেব মন্দির বাড়ী ঘর, গাছ পালা সমস্ত ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

যোগেশ্বর বাবুর প্রাসাদোপম বৃহৎ অট্টালিকার উজ্জ্বল দীপালোকিত উন্নত চূড়া মণিকার নিমেষহারা সজল দৃষ্টির সম্মুখ হইতে নিঃশেষে নিভিয়া যাইতেই তাহার বেদনার্ত্ত আকুল চিত্তে জাগিয়া উঠিল, পিতার সেই অসহায়, দীন, আর্ত্ত মুখচ্ছবি! বিদীর্ণ প্রায় বুকখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সে উচ্ছ্বসিত আকুল হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। হায়! জীবনের এই সুখ আশা ভরা তরুণ উষায় নির্ম্মেঘ

নির্ম্মল আকাশে আজ অতর্কিতে এ দারুণ বজ্রপাত কেন করিলে ভগবান্ ?

মুহ্যমানা মণিকার মনে হইল তাহার মর্ম্মাহত পিতার বেদনা মথিত হৃদয়ের জ্বলন্ত অভিশাপ বাণী, এবং বুক ফাটা জ্বালাময় গভীর দীর্ঘশ্বাসটুকু যেন এখানে—এত দূরেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে! হায়রে অদৃষ্ট! তাহার অজানা দীর্ঘ জীবন যাত্রার ইহাই কি পাথেয়? এইটুকুই কি সম্বল তাহার?

রোরুদ্যমানা মণিকার বিপর্য্যস্ত অবস্থায় সুধীর ব্যথিত হইয়া স্নেহকরুণ কণ্ঠে কহিল, "আমি তো বলেছিলুম তোমার বড় কষ্ট হবে,—তবে কেন এলে মণি?"

মণিকা তাহার উদ্বেল উৎসারিত অবাধ্য নয়নবারি বহু কষ্টে সম্বরণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, "আর কখনো কাঁদব না গো! শুধু আজকের দিনটী একটু কেঁদে নিতে দাও, নইলে আমি যে বুক ফেটে মরে যাব!"

বহুযত্নে উদ্বেলিত বিক্ষোভিত চিত্তাবেগ দমন করিয়া মণিকা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহার দুর্ব্বল অবাধ্য চিত্তকে বারম্বার শাসাইয়া ভাবিতে লাগিল সেই প্রাচীন যুগের চিরস্মরণীয়া পতিব্রতা নারীগণের গৌরবোজ্জ্বল পবিত্র আদর্শ জীবন কাহিনী। সেই যে দেবীচরিত্রা পুণ্যশ্লোকা সীতা, চিন্তা, সাবিত্রী, দময়ন্তী,—যাঁহারা রাজসুখভোগ স্বেচ্ছায় পরিহার করিয়া, আরাধ্যতম পতিদেবতার দুঃখের, দুর্দ্দিনের এক মাত্র সঙ্গিনীরূপে গহন বনে, পর্ব্বতে, দুর্গম কান্তারে অবিরত ছায়ার মত অনুগমন করিয়াছিলেন, রাজ নন্দিনী, রাজ ঘরণী হইয়াও স্বামীর সহিত

কত অবর্ণনীয়, অসহনীয় দুঃখ ক্লেশ অম্লান মুখে প্রসন্ন চিত্তে সহিয়াছিলেন, সেই সুপবিত্র নারীকুলেই না সেও জন্মগ্রহণ করিয়াছে? সেই সকল পুণ্যবতী শক্তিস্বরূপিনীদের শক্তির অংশ দিয়াই না তাহারও নারীহৃদয় গঠিত হইয়াছে?—তবে আজ এই সামান্য তুচ্ছ দুঃখ কষ্টে এমন অভিভূত মুহ্যমান হইয়া মণিকা তাহার কর্ত্তব্য ভুলিতেছে কেন? তাহার ইহ-পরকালের প্রত্যক্ষ দেবতার সমভিব্যাহারে গমন করিতে সে কেন এত কাতর অবশ হইয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছে? ছি ছি! তাহার নারীজন্মে শত ধিক্! মণিকার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ হইতে বেদনায় মূর্চ্ছাতুর পবিত্র নারীত্বটুকু বিবেকের তাড়নায় জাগরিত হইয়া সাড়া দিয়া উঠিল।

প্রবল অনুতাপে ও স্বামীপ্রেমে পূর্ণ হইয়া সে পতিতপাবনী প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী বক্ষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—স্বামী সেবা, স্বামী তুষ্টির জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া তাহার সমাগত অনভ্যস্ত কঠোর জীবন সে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবে।

স্বামীর ঐকান্তিক মঙ্গল কামনার মধ্যে নিজের নিজত্ব বিলাইয়া দিয়া, সুখে দুঃখে, কায় মন প্রাণে তাঁহারই অনুগতা সেবিকা হইয়া থাকিবে।

আঠারো।

সুধীরকে এত শীঘ্র ও হঠাৎ বধূসহ ফিরিতে দেখিয়া তাহার মামা এবং মামীমা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও কিছু আনন্দিতও হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। যখন শুনিলেন নির্ব্বোধ সুধীর শুধু আত্মাভিমান বশে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সাক্ষাৎ কল্পতরুরূপী ধনবান শ্বশুরের সহিত মনান্তর করিয়া বধূ লইয়া আসিয়াছে, তখন মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে তাঁহাদের আক্ষেপের সীমা পরিসীমা রহিল না এবং তাহার এই বিষম অবিবেচনা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

পরদিন মণিদের বাটীর পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সরকার মহাশয় তাহার পরিত্যক্ত অলঙ্কারের বাক্স ও বিবিধ বস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড ষ্টীল্ ট্রাঙ্ক্ লইয়া উপস্থিত হইলেন।

সুধীর তাঁহার সম্মুখে গেল না, পাশ কাটাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই সে অনুপস্থিত রহিল।

লজ্জিত অবিনাশ বাবু বৃদ্ধ সরকার মহাশয়ের কাছে ভাগিনেয়ের এই দুর্ম্মতি ও মতিচ্ছন্নর জন্য বিস্তর নিন্দা, এবং নিরীহ বেহাই মহাশয়ের দুঃখে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

সরকার মহাশয় মণিকাকে আনীত দ্রব্যাদি সমস্ত দেখাইয়া বলিলেন, "এই নাও মা, তোমার জিনিস সব দেখে শুনে নাও, আর তোমার যখনই যা দরকার হবে, তৎক্ষণাৎ লিখে জানিও, কর্ত্তা বিশেষ করে এ কথা বলে

দিয়েছেন। তোমাকে যেন কোনও রকম কষ্ট বা অসুবিধে না ভুগতে হয়।”

মণিকা বৃদ্ধ সরকার মহাশয়কে নমস্কার করিয়া নম্র কণ্ঠে ছল ছল চক্ষে বলিল, “আমার আর কিছুই চাই না, জ্যাঠামশাই, বাবাকে বলে দেবেন আমি বেশ ভাল আছি, এখানে আমার কোনও কষ্ট নেই।”

কিন্তু দিনকতক বাদে যখন যোগেশ্বরের প্রেরিত দুইশত টাকার মণিঅর্ডার দুর্ভাগ্য সুধীর সকলের অসাক্ষাতে চুপি চুপি ফেরত দিল, তখন তাহার সেই গোপন ও নূতন অপরাধ কোনওরূপে ধরা পড়িয়া বাড়ীতে একটা হুলুস্থুল বাধিয়া গেল।

অবিনাশ বাবু বিলক্ষণ রাগত ও বিরক্ত হইয়া অপ্রসন্ন গম্ভীর বদনে বলিলেন, “বাস্তবিক, ভদ্রলোককে এ রকম অনর্থক অপমান করাটা তোমার কি উচিত হয়েছে সুধীর! আমাদের কত বড় সৌভাগ্য যে অমন একজন মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়েছে, কিন্তু তুমি নিজের বুদ্ধির দোষে, শেষকালে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবে দেখছি!”

নীরদা মহাবিরক্তির সহিত চোখ ঘুরাইয়া ঝঙ্কার তুলিয়া কহিলেন, “এ যে একেবারে অবাক কাণ্ড বাপু! অত বড় যে রাজা শ্বশুর তা'র সঙ্গে মিছি মিছি ঝগড়া বিবাদ করে তেজ দেখিয়ে চলে এলে, তবু সে বেচারি ভদ্রলোক, ভদ্রতা দেখিয়ে খরচের টাকা পাঠিয়ে দিলে, জানে—অনাটনের সংসার, মেয়েটার কষ্ট হবে, তাও আবার ফর্‌কে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল, কেন রে বাপু? তবু যদি ছেলের এক কড়ি ঘরে আনবার যোগ্যতা থাকৃত!”

মামীমার এই অতি সহজ ও সত্য বাক্যগুলি তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলার মত সুধীরের মর্ম্মস্থলে কাটিয়া কাটিয়া বিঁধিয়া গেল।

সে অত্যন্ত লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া ক্ষুব্ধ ম্লান মুখে ধীরে বলিল, "আমি একটা কাজের জন্যে বিস্তর চেষ্টা করছি মামীমা, বক্সারে একটা মাষ্টারী শীগ্‌গিরি খালি হবে, খবর পেয়েছি। কাজটা পাবার খুবই আশা আছে, যত দিন না পাই, ততদিন আমাদের মুখ চেয়ে তোমাকে একটু কষ্ট সইতেই হবে যে মামীমা! দুবেলা দুমুটো দিতে পারো দিও, নইলে এক বেলাই—"

বাধা দিয়া নীরদা রাগে গর গর করিতে করিতে বলিল "হ্যাঁ, এমন আক্কেল না হ'লে কি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারে!" আরে বাপু একটুও বোঝ না, তুমি যেন ঘরের ছেলে, যা জুটল তাই খেলে, তাতে কারুর কিছু বলবার কইবার নেই, কিন্তু ঐ যে ভালমানুষের মেয়েটীকে জোর জবরদস্তি করে টেনে এনেছ, তাকে দুটী ভাল মন্দ সামগ্রী না দিলে সে বেচারি বাঁচে কেমন করে? আহা! সাত নয়, পাঁচ নয় বাপ মিন্সের ঐ একটী মেয়ে, সবে ধন নীলমণি, তাকে খামখা ঝোঁকের মাথায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে, এমন খোয়ার করবার কি দরকার ছিল বল? একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো!"

সেই মিষ্ট ভৎর্সনা ও গঞ্জনা নীরবে পরিপাক করিয়া লইয়া নিরুপায় সুধীর তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছোট ঘরখানিতে আত্মগোপন করিতে ঢুকিল। তাহার ভয় হইতেছিল মণিকা এই সংবাদ পাইয়া হয় তো কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিবে, কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া সে দেখিতে পাইল মণিকা খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া অনাবৃত ভূমিতলে একখানি ম্লান ছায়ার মত স্তব্ধ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। দেখিবামাত্র তাহার অবসাদগ্রস্ত ব্যথিত চিত্ত, আরও ভারাক্রান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

অনুতাপে ও ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া সুধীর মনে মনে ভাবিল, এই বিলাস বিভবের মধ্যে আজন্ম পালিতা ধনীর দুলালীকে দুঃখ ক্লেশ দিতে সে কেন এ দীন কুটীরে লইয়া আসিল? এই কি তাহার ধর্ম্ম-পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য?

কাছে আসিয়া ম্রিয়মানা মণির মাথার উপর হাত রাখিয়া সুধীর স্নেহবিগলিত করুণ কণ্ঠে ডাকিল, "মণিকা!—মণি!"

মণিকা তাহার মৌন গভীর ব্যথাভরা অশ্রুহীন আর্ত্ত চক্ষুদুটী স্বামীর পানে তুলিয়া ধীরে বলিল, "কি?"

"তুমি আমাকে ক্ষমা কর মণি! না বুঝে সুঝে যে কুকাজ করে ফেলেছি, তার জন্যে আমি বিশেষ অনুতপ্ত। কিন্তু মণি! আমার যা কর্ত্তব্য তা আমি ঠিক মত পালন কর্‌তে না পারলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি ভুল পথে চলিনি। তবু তুমি যদি ব্যথা পাও, তুমি যদি আমায় ক্ষমা কর্‌তে না পারো, তা'হলে—তা'হলে মণি—"

মণিকা ব্যগ্রতার সহিত ক্ষুণ্ণ মনে ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "সে কি কথা? আমি কি তোমায় কিছু বলেছি? টাকা চাও না, ফিরিয়ে দিয়েছ বেশ করেছ, তার জন্যে আমার কোনও ক্ষোভ নেই। যার সঙ্গে সব সম্পর্ক মিটিয়ে দিয়ে, সমস্ত দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে, অতি বড় পাষাণের মত মায়া মমতা সব ভুলে চলে এসেছি, তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণের বোঝ মিছে আর ভারি করে কি হবে বল?"

মণিকার সেই অবিচলিত স্থির কণ্ঠস্বরে একটা প্রচ্ছন্ন গোপন বেদনা ও অভিমান বাজিয়া উঠিতেছিল।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সুধীর একটা অন্তর্ভেদী গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া

খাটের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া তাহার উপস্থিত কর্ত্তব্য কি তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু কষ্ট বা অসুবিধা যতই হউক, তথাপি এত বড় দুর্ঘটনা ও অপমানের পর সেই ধন-গর্ব্বিত উদ্ধত প্রকৃতি শ্বশুরের অনুগ্রহজীবী হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে থাকার চেয়ে অনাহারে শুকাইয়া মরাও যেন সুধীরের বিবেচনায় শ্রেয়ঃ মনে হইল।

তবে বেচারি মণিকা, তাহার দুঃখময় দুরদৃষ্টের সহিত জড়িত হইয়া সে কেন বৃথা বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করিবে? সুধীর কি ভাবিয়া সহসা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও মণি! বল যাবে?" তা'হলে মামামাবুকে বলে তোমায় পাঠিয়ে দিই—"

খামখেয়ালী স্বামীটীর এই নূতন ভাবান্তরে আশ্চর্য্য; ক্ষুব্ধ হইয়া মণিকা অধীরতার সহিত বলিল, "কেন বল দেখি? আমার অপরাধ?—"

অতি বিমর্ষ বিরস মুখে সুধীর বলিল, "অপরাধ তোমার নয় মণি,—আমার। আমার ছন্নছাড়া লক্ষ্মীছাড়া জীবনের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে বৃথা তুমিও কেন দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে? তার চেয়ে বাপের কাছে থাক্‌লে অন্ততঃ খেয়ে পরে একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে তো? এর পরে যদি কখনও ভাগ্য পরিবর্ত্তন করতে পারি, তখন তোমাকে আবার নিয়ে আস্‌ব, নইলে—"

মণিকা ব্যথিত চিত্তে দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল—"বাঃ! বেশ ব্যবস্থা ঠিক করেছ তো আমার জন্যে! তোমাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে একা ফেলে আমি বাপের বাড়ী গিয়ে থাকব, নিতান্ত স্বার্থপরের মত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে?"

সুধীর লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "কি করি বল মণি, আর যে কোনও উপায় দেখি না। তোমার এ হতভাগা স্বামীর যে এতটুকু যোগ্যতা নেই—"

"উপায় তিনিই করবেন, যিনি তোমার অদৃষ্টের সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়িত করেছেন,—তুমি আমি সে কথা ভাববার কে?"

পত্নীর সরল বিশ্বাসে ভরা প্রেমময় বিশ্বস্ত হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া সুধীর বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া গেল।

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক, তাহার আদরিণী মণিকাকে সুখী করিয়া তাহার এই অতুলনীয় প্রণয়ের প্রতিদান দিবে।

———

উনিশ।

"এমন করে দিনরাত ভেবে ভেবে আর কি হবে যোগু? দেখ দেখি, শরীর যে একেবারে পাত হয়ে গেছে!"

মহামায়া ব্যথা কাতর দৃষ্টিতে ভ্রাতার সেই বজ্রদাবদগ্ধবিদ্ধস্ত শ্রীহীন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"কি করব দিদি!—আমার মণিকাকে যে আমি কিছুতেই ধরে রাখতে পারলুম না!—মণিহারা হয়ে আমি বাঁচি কেমন করে বল?"

বেদনা মথিত পিতৃ হৃদয়ের সেই সকরুণ আর্ত্ত বিলাপে দারুণ ব্যথা পাইয়া মহামায়া সবিষাদে কহিলেন, "এই জন্যেই বলে মেয়ে পরের ধন। তাই বলে মণি যে আমাদের মায়া মমতা কাটিয়ে এক কথায় ছেড়ে চলে যাবে, এ কি কখনো আমরা ভেবেছিলুম? সত্যি, মণির আর আমাদের ওপর সে টান নেই, নইলে—"

যোগেশ্বর বাবু আহত হইয়া সনিঃশ্বাসে কহিলেন, "না দিদি, মণির কোনও দোষ নেই,— বড় বুদ্ধিমতী, বড় লক্ষ্মী মেয়ে সে, নিজের সুখ দুঃখ সব তুচ্ছ করে, তা'র নিজের পথ নিজেই বেছে নিয়েছে। আমার বড় সাধের বড় গৌরবের ধন মণিকে আমার প্রাণপাত করে শিক্ষা দেওয়া সার্থক হয়েছে দিদি, সেজন্য আমার আপশোষ নেই। তবে যদি জানতুম মেয়েটা আমার সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে রয়েছে আর জামাই যদি এমন ঝগড়া বিবাদ করে, তাকে জোর করে টেনে না নিয়ে যেত, তা'হলে

তবু মনকে একটা সান্ত্বনা দেবারও উপায় ছিল। কিন্তু এ যে একেবারেই বিপরীত কাণ্ড!”

মহামায়া আক্ষেপের সহিত বলিলেন, “সকলি কপালে করে ভাই, নইলে সেই শান্ত শিষ্ট সুধীর সে যে শেষকালে এমন একগুঁয়ে পাষণ্ড হয়ে দাঁড়াবে, একথা কে ভেবেছিল বল?”

যোগেশ্বর ক্ষোভের নিঃশ্বাস গ্রহণ করিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, “কারও দোষ নয় দিদি! দোষ আমার ভাগ্যের। পরের ছেলেকে আপন করবার আশা করাই আমার ভুল হয়েছিল। এর চেয়ে দেখে শুনে কোনও বড় ঘরে মেয়েটাকে দিলে তবু খেয়ে পরে সুখে থাকতো তো! এ যে শিব গড়তে বাঁদর হয়ে গেল।”

সেই সময় সুধীরের ফেরত দেওয়া মনিঅর্ডার ভৃত্য লইয়া আসিয়া বলিল, “সরকার মশাই আপনাকে দিতে বল্লেন।”

যোগেশ্বর বাবুর চক্ষের সম্মুখে যেন বিশ্বের আলো নিভিয়া গেল, হায় রে দুর্ভাগ্য! এত দুঃখ এত অপমানও বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলেন! কম্পিত হস্তে প্রত্যাখ্যাত টাকাগুলি একপাশে রাখিয়া দিয়া যোগেশ্বর নিস্পন্দ স্তম্ভিত হইয়া ভূতাবিষ্টের মত বসিয়া রহিলেন।

মহামায়া শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “কি হ'ল যোগু!—এ টাকা ফিরে এলো কেন? সুধীর কি গাজিপুরে নেই নাকি?”

ভ্রাতাকে তখনও স্তব্ধ নির্ব্বাক দেখিয়া মহামায়া উদ্বেগে অধীর হইয়া পুনরায় বলিলেন, “কি হয়েছে, বল না যোগু! আমার যে বড়ই ভয় করছে—মণি ভাল আছে তো?”

যোগেশ্বর বাবু একটা অন্তর্ভেদী গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া

কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "উঃ! এত দর্প? এত অহঙ্কার!—আমার দেওয়া সাহায্য পর্য্যন্ত সে নিতে চায় না! ওঃ! কি মস্ত ভুলই করে ফেলেছি আমি, এত বড় পাষণ্ডের হাতে দেওয়ার চেয়ে মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলুম না কেন?"

ব্যাপার বুঝিয়া মহামায়াও দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু সুধীর এখনও ছেলে মানুষ যোগু,—তাই হিতাহিত না বুঝে শুধু খেয়ালের ঝোঁকে এমন একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে। এর পর যখন নিজের ভুলটুকু বুঝতে পারবে, তখন আবার আপনাহতেই ফিরে এসে তোমার পায়ে ধরবে দেখো।"

যোগেশ্বর হতাশ বদনে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "না দিদি, সে পিত্যেশ করো না,—সুধীর যে ধাতের ছেলে তা তুমি এখনও ঠিক বোঝনি তাই এ কথা বলছ। সে ভাঙ্গবে তো নুইবে না! নইলে শুধু আত্মসম্মানের খেয়ালে এত বড় রাজ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন কাটিয়ে এক কথায় চলে যায়! তারপর রাগের মুখে অমন একটা শক্ত দিব্যি করে ফেলেছে, তখন আর সে কখনও এ মুখো হচ্ছে না।"

গুরু বেদনার ভারে অবসন্ন হইয়া ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই কিয়ৎক্ষণ হতবাক্ মৌন হইয়া রহিলেন। তারপর সেই গাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মহামায়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তা'হলে তুমি এখন কি রকম করবে যোগু?—একবার নিজেই গিয়ে দেখবে নাকি?"

"কোথায় যাব দিদি?"

"কেন?—গাজিপুরে, মণির শ্বশুর বাড়ী। সুধীরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি ফিরিয়ে আনতে পাবো—"

যোগেশ্বর দারুণ অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ দিদি? এত অপমানের পর, আবার আমি নিজে শেধে যাব, সেই ছোট লোকের ছেলের খোসামোদ করতে?—যে আমার মান অপমানের দিকে চাইলে না,—আমার দুঃখ কষ্ট বুঝলে না,—না দিদি, আমার প্রাণ থাকতে তা পারব না।"

মহামায়া ক্ষুণ্ণ অন্তরে কহিলেন, "কিন্তু মাঝে পড়ে মেয়েটা যে খুন হয়ে যাবে ভাই, তাদের ঘরের অবস্থা তো জানোই,—আহা! বাছা আমার মুখ বুজে না জানি কত কষ্টই সইতেছে! টাকা যদি ফেরত না দিত, তা'হলেও বা এক কথা ছিল।"

এতক্ষণ পরে যোগেশ্বরের চক্ষের পাতা ভিজিয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ আর্দ্র কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "তা কি করা যায় বল? মণি আমার সুখে থাক্‌বে, ভাল থাক্‌বে বলেই না ঘরজামাই করেছিলুম? কপাল হ'তে সবই যে উল্টে গেল।"

যোগেশ্বর অশান্ত মনের অদমনীয় উচ্ছ্বাস গোপন করিতে অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

বাটীর যে অংশ মণিকার লেখা পড়া ও শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, অনিচ্ছা মৃদু গতিতে তিনি সেই দিকে উপনীত হইলেন।

সেই জন শূন্য কক্ষগুলির যেখানে যে জিনিষ যেমন ভাবে সজ্জিত ছিল, সমস্তই তেমনি রাখা আছে। মূল্যবান মেহগ্‌নী কাষ্ঠে নির্ম্মিত সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর দুগ্ধ ফেননিভ শুভ্র কোমল শয্যা অব্যবহৃত অবস্থায় প্রসারিত।

ছোট কাঁচের আলমারীতে মণিকার স্বহস্ত নির্ম্মিত কত টুকি টাকি

সৌখীন শিল্প কার্য্য, দেয়ালের গায়ে তাহারই চিত্রিত করা সুন্দর ছবিগুলি, বুক্ সেল্ফের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত মণির মুক্তার মত সুছাঁদ হস্তাক্ষরে নাম লেখা ঝক্ ঝকে পুস্তকগুলি সমস্তই যেন তাহাদের অধিকারিণীর স্মৃতি জাগাইয়া তাহারই আশা পথ চাহিয়া রহিয়াছে।

মণির বড় সাধের হার্ম্মোণিয়ম, বাদিকার সুকোমল নিপুণ করস্পর্শের অভাবে যেন গভীর বিষাদে মৌন স্তব্ধ হইয়া আছে।

যোগেশ্বর কতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা দুহিতার পরিত্যক্ত কক্ষগুলিতে সুখ শান্তিহীন প্রেতের মত উদভ্রান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই জনহীন নিস্তব্ধ ঘরের বিরাট শূন্যতা যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। চারিদিক হইতে আদরিণী মণিকার সহস্র স্মৃতি ছুটিয়া আসিয়া যেন বিপুল বেদনায় কাঁদিয়া বলিল, "নাই গো!—সে যে আর নাই!"

শয়ন কক্ষের একটী পার্শ্বেই মণির নিজের হাতে ফুল তোলা টেবিল ক্লথে ঢাকা ছোট টেবিলটীর উপর সুদৃশ্য ফোটো ষ্ট্যাণ্ডে আঁটা তিনখানি ফোটো পর পর সাজান ছিল, একখানি মণিকার বিবাহের কিছুদিন পূর্ব্বে তোলান হইয়াছিল, কুমারী মণিকা একটি পুষ্পিত বৃক্ষ কাণ্ডে হেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আলুলায়িত কুঞ্চিত দীর্ঘ কুন্তলরাশি বাহু মূলের উপর দিয়া আসিয়া জানুর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাহার আসন্ন যৌবনের অভিনব লালিত্যময় সুকুমার সুন্দর মুখচ্ছবিতে একটা অচিরাগত নব সুখ সম্ভাবনায় সলজ্জ সঙ্কোচ ভরা মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অন্যখানি বিবাহের পর লওয়া হইয়াছে। সে খানিতে নব পরিণীতা

নূতন সৌভাগ্যে মণ্ডিতা তাহার তরুণ দয়িতের পাশে হাস্যস্ফুরিত অধরে, পুলকোজ্জ্বল আননে বসিয়া আছে। মনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও উচ্ছল পুলক ভাবাবেশে মণির আয়ত নয়ন দুটী যেন ভরা তটিনীর নির্ম্মল বারির মত ঢল ঢল ঝলমল্ করিতেছে।

অন্যটী মণির বাল্যকালের চিত্র। ক্ষুদ্র ক্রীড়া চঞ্চলা বালিকা একটী বড় মোমের পুতুল ক্রোড়ে লইয়া হাসি হাসি মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সুন্দর কচি মুখখানি এবং উজ্জ্বল চপল চক্ষু দুটীতে যেন শিশু সুলভ সরলতা ও কৌতুকের ভাব মাখান রহিয়াছে।

ফোটখানি অপলকনেত্রে দেখিতে দেখিতে যোগেশ্বরের জ্বালাদগ্ধ চক্ষুদুটী অশ্রুজলে সিক্ত আদ্র্র হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এই এতটুকু ছোট্ট মণি, যেন জলে ধোয়া শুভ্র যুঁই ফুলটী! -প্রজাপতির মত রঙ্গিন্ পোষাকে সজ্জিত হইয়া লাল ফিতায় সুসংবদ্ধ এলোচুলগুলি বাতাসে দোলাইয়া মিষ্ট কোমল কণ্ঠে 'বাবা! বাবা!' বলিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিত, নবনীত কোমল কচি হাত দুখানিতে পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সুমধুর কল কাকলীতে মধু বর্ষণ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম শ্রান্ত তৃষিত সন্তপ্ত হৃদয়খানি একনিমেষে জুড়াইয়া দিত সেই মণি, একান্ত তাঁহারই মণি,—আজ এমন নিষ্ঠুর হইল কেমন করিয়া?—বেদনা বিহ্বল হতভাগ্য আর্ত্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিতে আজ তো সে তেমনি করিয়া ছুটিয়া আসিবে না!

অপত্যস্নেহে মুগ্ধ দুহিতৃগতপ্রাণ পিতার বেদনার্ত্ত হৃদয়ে তখন যে কি তুফান উঠিয়াছিল, তাহা সেই অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

স্নেহ বুভুক্ষিত উত্তপ্ত বক্ষের উপর মণির সেই ছোট ছবিখানি চাপিয়া

ধরিয়া যোগেশ্বর দরবিগলিত নয়নে আর্ত্ত করুণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মাগো! তোর মনে কি শেষে এই ছিল? কোথায় গেলি আমার,—মা আমার!—ফিরে আয়! তোর হতভাগা বাপের শূন্য কোলে ফিরে আয় মা, ফিরে আয়!"

কিন্তু সেই অশ্রুভরা স্নেহমথিত আকুল আহ্বানে আজ আর কেহই সাড়া দিল না। শুধু শূন্য কক্ষের নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিধ্বনি কাঁদিয়া উঠিল।

বিশ্বজয়ী অপত্যস্নেহের প্রবল উচ্ছ্বাসবেগে স্নেহময় জনকের আভি-জাত্যের গর্ব্ব ও মান অভিমান সমস্তই যেন ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

মোহাচ্ছন্ন যোগেশ্বর কতক্ষণ পরে কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া, আর্দ্র চক্ষু দুটী মুছিয়া ফেলিয়া সেই মণি-স্মৃতিময় স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, যাইবার সময় ঘরগুলির দরজা স্বহস্তে সাবধানে রুদ্ধ করিয়া দিলেন,—কিন্তু হায়! এ মায়াময় জগতে মানুষের মর্ম্মদাহকারী দুঃখের স্মৃতির দুয়ারগুলিও যদি এমনি করিয়া রুদ্ধ করা যাইত!

কুড়ি

আজ রবিবার,—অফিসের ছুটী। তাই নীরদা একটু বেশী বেলায় রান্না চড়াইয়া হাতের কাজ শীঘ্র সারিয়া লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কর্ত্তা মাসকাবারি বাজার করিতে গিয়াছেন। সুধীরও অনুপস্থিত। নীরদার ছোট মেয়ে বেলা উঠানের একটী পাশে যেখানটীতে পাঁচীলের ছায়া পড়িয়া একটুখানি স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, সেইখানে খেলাঘর পাতিয়া তরকারীর খোসার ব্যঞ্জন এবং খুদের ভাত রাঁধিতে ব্যাপৃত ছিল।

নীরদা দালের বক্‌নো নামাইয়া চচ্চড়ীটা চড়াইয়া দিয়া পাঁচফোড়নের সোঁদা গন্ধে ও লঙ্কার ঝাঁজে কাসিতে কাসিতে দরজায় উঁকি দিয়া বলিল, "বেলা! তোর বউদি কোথায় গেল রে?"

বেলা তাহার ক্ষুদ্র লৌহ কটাহে কোটা তরকারীর খোলাগুলি নিক্ষেপ করিয়া ছ্যাঁক্ কল্ ল্-ল্-ল্ করিয়া নিজের মুখেই তরকারী রন্ধনের কৃত্রিম শব্দ করিতেছিল। মাতার আহ্বানে কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল, "তা আমি কি জানি?"

নীরদা ধমক দিয়া কহিল, "জান না তো একবারটী উঠে দেখেই এস না—"

বেলা অগ্রাহ্যের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? আমি এখন উঠ্‌তে পারি না!—আমার তরকারী পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!"

"দূর তোর তরকারীর নিকুচি করেছে, যা শীগ্‌গির বলছি—"

মায়ের রাগ যে কতদূর আশঙ্কাজনক, বেলার তাহা অজ্ঞাত ছিল না, তাই মুখ ফুলাইয়া, "এইতো বউদি এতক্ষণ এইখানেই ছিল! যেই গিয়েছে অমনি দরকার পড়ল!" বলিতে বলিতে ফর্ ফর্ করিয়া সে মণিকার খোঁজে চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই মণিকা বেলার হাত ধরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডাকছেন মামীমা?"

নীরদা অঞ্চলে ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "হ্যাঁ, কি করছিলে?"

মণিকা কুণ্ঠিতভাবে মৃদু স্বরে কহিল, "কিছু না,—একখানা চিঠি লিখ্‌ছিলুম—"

"এখন কি চিঠি লেখবার সময় বাছা? একা মানুষ, কাজের থাই পাই না, এদিকে কর্ত্তা এলেন বলে—"

মণিকা কিছু লজ্জা পাইয়া বলিল, "আপনি তো আর এখন কোনও কাজ নেই বল্লেন মামীমা! তাই—"

"গেরস্ত ঘরে কাজের কি শেষ আছে মা! তবে তুমি নাকি কোনও কাজ গুছিয়ে করতে পার না—সেই জন্যেই বলি না তোমায়—"

মণিকা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া সানুনয়ে বলিল, "আমাকে শিখিয়ে নিন্ না মামীমা!"

বধূর বিনয়ে প্রসন্ন হইয়া নীরদা বলিল, "তা তো শেখাবই মা! তুমি তো আমার পর নও,—আমার বড় আদরের সুধীরের বউ,—আমার ঘরের লক্ষ্মী তুমি। আচ্ছা,—এখন খপ্ করে দু গাঁট হলুদ বেটে দাও দেখি,—মাছ কখানা ভাজতে পড়ে রয়েছে।"

মণিকা প্রসন্ন মনে শাশুড়ীর আদেশ পালন করিতে গেল। এ সংসারে

মণিকার আর সে পূর্ব্বের মত আদর যত্ন নাই। সুধীর বধূ লইয়া কয়েক দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছে ভাবিয়া নীরদা তাহাদের অতি আগ্রহ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যখন ভিতরের কথা জানিতে পারিল, তখনই সেই যত্ন ও আদরের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

তারপর আবার শ্বশুরের প্রদত্ত অর্থ সাহায্য প্রত্যাখান করিয়া নির্ব্বোধ সুধীর মামা ও মামীমাতার অপ্রসন্নচিত্ত আরও বিমুখ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা ভাগিনেয়কে মুখ ফুটিয়া বিশেষ কিছু না বলিলেও তাহার জন্য মণিকাকে ইদানীং অল্প বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতে ছিল।

অনভ্যস্ত হাতে হলুদ বাটিতে গিয়া মণিকাকে এক নূতন বিভ্রাটে পড়িতে হইল। নোড়া দিয়া থেঁতো করিবার সময় হলুদের ছোট ছোট টুক্‌রা গুলি সজোরে ছিটকাইয়া দূরে পাড়তে লাগিল এবং হলুদের জলেব ছিটা লাগিয়া পরনের সদ্য ধৌত সাড়ীখানি রঞ্জিত হইয়া উঠিল দেখিয়া নীরদা শশব্যস্তে বলিল, "ও মা গো! ওকি হচ্ছে বৌমা? আহা! অমন সুন্দর শান্তিপুরে সাড়ীখানা নষ্ট করে ফেল্লে! থাক্ মা, তোমার আর হলুদ বেটে কাজ নেই,—কড়াখানা নাবিয়ে আমিই বেটে নিচ্ছি—"

"না না, আপনি বসুন, আমি এখনি বেটে দিচ্ছি মামীমা!" অপ্রতিভ মণিকা কোনও মতে হলুদ বাটা শেষ করিয়া উঠিল। তারপর হাত ধুইয়া অন্য আদেশের অপেক্ষায় রান্নাঘরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

নীরদা হরিদ্রা রঞ্জিত মৎস্যগুলি তপ্ত তৈলে ছাড়িতে ছাড়িতে বধূর আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "ধোঁয়ায় দাঁড়িয়ে রইলে কেন বউমা? চোখ মুখ যে লাল হয়ে উঠল!"

মণিকা কুণ্ঠানত নয়নে কহিল "আর যদি কোনও কাজ টাজ থাকে—"

নীরদা স্নেহের হাসি হাসিয়া নম্র স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "বল্লুম তো, আমাদের ঘরে কাজের কি আর শেষ আছে রে পাগ্‌লী ?"

মণিকা জো পাইয়া আবদারের ভাবে বলিল, "তা হলে এখন আর কি কাজ করতে হবে বলুন না মামীমা !"

বধূর কাজ করিবার আগ্রহ দেখিয়া নীরদা সন্তুষ্ট চিত্তে কহিল, "এখানে তো আর কোনও কাজ নেই, তবে মাসকাবারি তোলবার আগে ভাঁড়ারটা একবার নিকোবো ভেবেছিলুম কিন্তু রান্না চড়াতেই বেলা হয়ে গেল—"

মণিকার পিত্রালয়ের গোয়াল ঘর পর্য্যন্ত পাকা সিমেণ্ট্ করা, সুতরাং এই ঘর নিকানো কার্য্যটী তাহার সম্পূর্ণই অজ্ঞাত ছিল, তথাপি শাশুড়ীকে তুষ্ট করিবার জন্য সে আগ্রহ জানাইয়া বলিল, "আমি নিকোবো মামীমা।"

"তুমি পারবে ?"

মণিকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—পারিবে।

নীরদা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "তা হলে ঐ নাইবার ঘরের পিছনে মাটি ভিজিয়ে রেখেছি, আর সেইখানেই হাঁড়িতে গোবর আছে জান তো ? দুই মিলিয়ে বেশ পুরু করে নিকোতে হবে,—পোড়া মেটে বাড়ীতে গোবর না দিলে কি রক্ষে আছে ? ধূলোয় ধূলোয় উচ্ছন্ন !"

মামীমার আজ্ঞা পালন করিতে তৎপর হইয়া মণিকা চলিয়া গেল। কিন্তু খানিক বাদে বেলার উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া নীরদা

সেখানে গিয়া দেখিল, বেলা হাসির ধমকে একেবারে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, আর অপ্রতিভ মণিকা কাদা মাথা হাত দুখানি যোড় করিয়া মিনতি ভরা চাপা গলায় বলিতেছে, "দোহাই ঠাকুরঝি! চুপ কর ভাই মামীমা যেন না জানতে পারেন—"

নীরদা ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে বেলা?—অত হাসছিস্ কেন?—আ গেল যা! শুধু শুধু হেসেই মরছে!"

বেলা তাহার উৎসারিত হাসির প্রস্রবণ কষ্টে রোধ করিয়া বলিল, "মা গো মা! না হেসে কি করি বল, ভারি একটা মজা হয়েছে, তুমি যদি দেখ্‌তে—"

কন্যার বাচালতায় নীরদা ধমক দিয়া কহিল, "কি হয়েছে তাই বল্ না বাপু! অত শত শোন্‌বার আমার এখন সাবকাশ নেই।"

লজ্জিত মণিকার পানে একবার সসঙ্কোচে চাহিয়া তাহার অনুনয়ভরা চক্ষু দুটীর নীরব অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বেলা মাকে বলিল, "কি হয়েছে তা বলি! তুমি বউদিকে বুঝি ঘর নিকোতে বলেছিলে? তাই গোবরের হাঁড়ীতে হাত দিতেই একেবারে আউ মাউ করে আঁৎকে উঠেছে, গোবরে পোকা ছিল নাকি—" বলিতে বলিতে বেলা আবার হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু নীরদা সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না, মুখখানা বেশ একটু গম্ভীর করিয়া সে অপ্রসন্ন স্বরে কহিল, "পারবে না যদি তবে করতে আসা কেন বাপু? গরমের দিনে দুদিন রাখা থাক্‌লেই গোবরে পোকা ধরে যায়, এতো কোনও আশ্চর্য্য কথা নয়? তাই বলে

আমাদের গরীবের ঘরে এতটা ঘেন্নাপিত্তি করলে চলবে কেন? হ'লই বা বড় মানুষের মেয়ে, বাপ্ তো পাঁচটা ঝি চাকর রেখে দিচ্ছে না?"

এই খোঁচা দেওয়া কথাগুলি মণিকাকে বিশেষ ভাবে আহত করিল। সে মনের ঘৃণা সঙ্কোচ সজোরে ঠেলিয়া আরক্তিম মুখে দুই হাতে সেই দুর্গন্ধময় গোময় তুলিয়া ভিজা মাটীর সহিত মাখিতে আরম্ভ করিল। তখন দুঃখে অভিমানে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল, পিসীমা ও বাবার উপর মনে মনে খুব রাগ হইতেছিল। তাঁহারা মেয়েটীকে কেন এত 'পুতু পুতু' করিয়া এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিলেন?—ঐ সব ছাই ভস্ম শিল্প কর্ম্ম ও লেখা পড়া না শিখাইয়া নিত্যাবশ্যকীয় গৃহস্থালীর কাজ শিখাইলে মণিকাকে আজ এমন ভাবে পদে পদে লজ্জিত ও অপদস্থ হইতে হইত না তো!

বধূর মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া নীরদা তাহার কার্য্যে বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ থাক্ তোমার আর ঘর নিকিয়ে কাজ নেই মা,—সময় মত আমিই করে নেব খ'ন। তুমি যাও, হাত ধুয়ে ফেলগে।"

মণিকা আনত বদনে মৃদু অনুনয়ের সুরে বলিল, "না মামীমা, আমি এখনি নিকিয়ে দিচ্ছি।"

"কথা বল্লে শুন্‌বে না যখন, তখন তোমার যা খুসী তাই করগে—" ভাতের হাঁড়ী নামাইবার জন্য পাকশালার দিকে যাইতে যাইতে নীরদা মুখ ভার করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল, "এতেই বলে কি না মামীমা আমাকে কাজ করতে দেয় না। কুট্‌নো কুট্‌তে হাত কেটে রক্তপাত করবে, দুধ জ্বাল দিতে পায়ে ফোস্কা তুলে বসে থাক্‌বে, গোবর ছুঁলে

আঁৎকে উঠ্‌বে, গেরস্ত ঘরে বউঝিরা আর কি কাজ করে বাপু? হ্যাঁ, কাজের লোক ছিল বটে সুধীরের মা,—আহা! সকল কর্ম্মে তৎপর, আমাকে সংসারের কুটোটী ভেঙ্গে তুখান করতে দিত না, সেই শ্বাশুড়ীর উপযুক্ত বউ হতে পারো, তবেই না।"

বহুকষ্টে ঘর নিকানো শেষ করিয়া মণি যখন উঠিল, তখন চিরদিনের অনভ্যাসের ফলে তাহার পা তুখানি ধরিয়া গিয়াছে, ঘর্ষণ লাগিয়া হাত তুটী জ্বালা করিতেছে।

সেই সময় বেলা মল বাজাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও গো বউদি! দাদা যে তোমাকে ডাক্‌ছেন,—শীগ্‌গির চল, শীগ্‌গির—"

"রসো না ভাই, আগে হাতটা ধুয়ে নিই—"

চপলা বালিকার আর বিলম্ব সহিতেছিল না, "হাত পরে ধুয়ো, আগে কি বলছেন তাহা শুনে এস—আহা! এস না বাপু—" বলিতে বলিতে সে মণির আঁচল ধরিয়া টানিয়া একেবারে সুধীরের সম্মুখে লইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

মণিকার কাদা মাখা হাত তুখানির দিকে দেখিয়া সুধীরের আনন্দ প্রদীপ্ত মুখখানি অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে তিক্ত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "একি দশা করেছ মণি? ছি ছি! শীগ্‌গির করে হাত ধুয়ে এস গে, যাও।"

কথাটা শুধু সহানুভূতির ভাবেই বলা হয় নাই, সঙ্গে যেন একটা ভৎ‍র্সনাও মিশ্রিত ছিল। সুতরাং কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া একটা চড় মারিয়া পরক্ষণেই সহানুভূতি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করে, "আহা বড্ড বেশী লাগ্‌ল নাকি?" তখন প্রহৃত ব্যক্তির মনের ভাব যেরূপ হয়, মণিকার মনের অবস্থাও ঠিক্ সেইরূপ হইল।

তাহার ইচ্ছা করিতেছিল তখনই একবার মুখ ফুটিয়া স্বামীকে শুনাইয়া দেয়, "আমার এ দশা তো শুধু তোমারই অনুগ্রহে!" কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিয়া লইয়া মণিকা ধীর সংযতভাবেই বলিল, "হাত ধুতেই তো যাচ্ছিলুম, মাঝখানে ঠাকুরঝি জোর করে টেনে নিয়ে এল।"

মণিকা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই সুধীর ডাকিল, "মণি!"

মণি ফিরিয়া বলিল, "কি?"

"ও সব ছাই ভস্ম ঘেঁটে কি করছিলে এতক্ষণ?"

"কি আর করব? ভাঁড়ার ঘর নিকোচ্ছিলুম।"

সুধীর স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেই মণি,—বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী, সম্ভ্রান্ত পিতার সুখ পালিতা, একমাত্র আদরিণী দুহিতা, তাহার এই কষ্ট ও হীনতার জন্য সে নিজেই তো প্রধানতঃ অপরাধী!

গভীর অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া সুধীর ব্যথাবিদ্ধ গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "আজ তোমাকে একটা সুখবর দিতে এসেছিলুম মণি,—কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে তোমার যা দুর্গতি করেছি,—দেখে আর বল্‌তে প্রবৃত্তি হ'ল না।"

কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া মণিকা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি সুখবর গা?—তোমাদের রেজল্ট্ বেরিয়েছে বুঝি?"

সুধীরকে তখনও গম্ভীর মুখে নির্ব্বাক দেখিয়া মণিকা তাহার গোময় লিপ্ত হাতখানি তাহার মুখের কাছে তুলিয়া রহস্যচ্ছলে হাসিতে হাসিতে বলিল, "বল না, বল,—তুমি পাশ হয়েছ তো?—না বল্লে এই হাত তোমার মুখে বুলিয়ে দেব।"

সহিষ্ণু প্রতিমা মণিকার অসামান্য ধৈর্য্য শক্তি দেখিয়া সুধীর বিস্মিত প্রীত হইয়া উঠিল। তাহার সেই বিষণ্নতা ও গাম্ভীর্য্য আর বেশীক্ষণ টিঁকিতে পারিল না। সে তখন প্রফুল্ল মুখে বলিল, "আমি পাশ হয়েছি মণি,—প্রথম বিভাগে—আর বিনয়ও পাশ হয়েছে।"

মণিকার সুন্দর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হর্ষোৎফুল্ল স্বরে বলিল, "সত্যি ?—ওমা! তবে এতক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসে ছিলে কেন ? পাশের খবর পেয়েও কি তোমার আহ্লাদ হচ্ছে না ?"

সুধীর একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমার আনন্দ সেই দিন হবে মণি,—যেদিন নিজের চেষ্টায় তোমার এ দুর্দ্দশা ঘুচিয়ে আমার ইচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব। আমার জন্যে তুমি যে কত দুঃখ, কত ক্লেশ অম্লান মুখে সহ্য করছ, আমি কি তা দেখিতে পাচ্ছি না মণি ?—আমি কি অন্ধ ?"

"বালাই! কেন তুমি অন্ধ হতে যাবে ? এই যে তোমার ইয়া বড়া বড়া দু দুটো কমল আঁখি রয়েছে—" বলিতে বলিতে মণি হাসিয়া পলায়ন করিল।

একুশ।

যোগেশ্বর বাবু সে দিন "ছোটলোকের ছেলের খোসামোদ করতে পারব না" বলিয়া ভগিনীর কাছে আস্ফালন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধোগামিনী মায়ার প্ররোচনায় তাঁহার সেই গর্ব্ব বা জেদ্ অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, বাৎসল্য স্নেহের দুর্জ্জয় শাসনে তাঁহার স্নেহ পিপাসিত ব্যাকুল চিত্ত, অন্ধকার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা,—অদর্শিতা দুহিতার পানে ততই অধীর আগ্রহে অবনত হইয়া পড়িতেছিল। যে দিন জামাতার পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইলেন, সেদিন আর কোনও মতে স্থির থাকিতে না পারিয়া যোগেশ্বর ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আর শুনেছ দিদি! সুধীর পাশ হয়েছে,—বেশ ভাল নম্বরে। ছোক্‌রা সকল দিকেই ভাল ছিল, কিন্তু এদানী কি যে দুর্ম্মতি ধরল—" কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা অনুতাপের কাতর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বহুদিন পরে ভ্রাতার মুখে একটা আশার আভাস দেখিয়া মহামায়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "সত্যি, বিদ্যেয় বল, বুদ্ধিতে বল আমাদের সুধীরের মত ছেলে অল্পই দেখা যায়। তবে তা'র মন যে কিসে উচাট হয়ে গেল,— কেন যে সে এমন ছেলেমানুষি করে ফেল্লে, তা' ভগবানই জানেন।"

ভ্রাতাকে নীরবে চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া মনে সাহস পাইয়া মহামায়া

বলিলেন, "আমি বলি কি যোগু, তুমি একবারটী যাও, পাশের খবর পেয়ে সুধীরের মনটা এ সময় নিশ্চয় বেশ ভাল আছে, এ সময় তুমি যদি নিজে গিয়ে তা'দের আন্‌তে পারো, তা'হলে আর না বলবার পথ পাবে না।"

মহামায়া ভ্রাতার মনের গোপন ইচ্ছাই টানিয়া বাহির করিলেন। আজ সুধীরের পাশের সংবাদ পাওয়া পর্য্যন্ত যোগেশ্বরের হতাশ ক্ষুব্ধ প্রাণ এমনই একটা আশা ও সুখ সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একটু দ্বিধার ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তাই তো, যাব নাকি একবার? তোমার কি তা'ই ইচ্ছে দিদি?"

"হ্যাঁ ভাই! আমি তো আগেই বলেছি এখনো বল্‌ছি, তুমি গেলে তারা নিশ্চয় আসবে। তা' না হ'লে এ শূন্য পুরীতে আর যে তিষ্ঠোতে পারা যায় না যোগু! দিন গুলো কাটে কেমন করে?"

যোগেশ্বর আর আপত্তি না করিয়া কপাল ঠুকিয়া সেইদিনই বৈবাহিক ভবনে গমন করিলেন। তাঁহার মত মান্য গণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনে সুধীরের মাতুল গৃহে একটা বিপর্য্যয় হুলুস্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। বেহাইকে অনর্থক ব্যতিব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া যোগেশ্বর সবিনয়ে জানাইলেন তিনি একটুখানি বিশ্রাম লইয়াই ফেরত ট্রেণে কন্যা ও জামাতাকে লইয়া যাইবেন।

সুধীর তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য মনে মনে অনুতপ্ত ও নিজের অক্ষমতায় বিলক্ষণ লজ্জিত হইয়াছিল। তা'ই শ্বশুরের কাছে মুখ ফুটিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করিলেও সে প্রকাশ্যে কোনওরূপ বিরুদ্ধ ভাব দেখাইল না। কিন্তু প্রাণাধিকা দুহিতার দীন হীনের মত বাসগৃহ,—ও অযত্নে মলিন শ্রীহীন

মুখকান্তি দেখিয়া পিতার স্নেহসিক্ত কোমল অন্তর জামাতার প্রতি পুনরায় বিমুখ হইয়া উঠিল। দুঃখে ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া তিনি জামাতাকে তিরস্কার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সুতরাং এই ঘটনায় শ্বশুর জামাতার মনের বিরাগ আরও বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল।

রুষ্ট যোগেশ্বর বাবু যখন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমার মেয়েকে এমন করে চোখের সামনে বলিদান দিতে পারব না আমি, এখনি তাকে নিয়ে যেতে চাই।"

সুধীরও তখন রুখিয়া উঠিয়া বলিয়া বসিল, "বেশ তো, তা'র যদি ইচ্ছে থাকে, স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, আমি তো জোর করে ধরে রাখিনি!"

সাশ্রুনয়না প্রণতা কন্যাকে পরম আগ্রহে বুকে টানিয়া যোগেশ্বর বেদনার্ত্ত করুণকণ্ঠে কহিলেন, "চল মা! তো'কে নিয়ে যাই,—এখানে এমন করে আর কদিন বাঁচবি মা! এরি মধ্যে শরীর যে আধখানি হয়ে গেছে—"

মণিকা কিছুই বলিতে পারিল না, পিতার স্নেহোদ্বেলিত বক্ষে মুখ গুঁজিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

যোগেশ্বর ব্যগ্র ব্যাকুলতার সহিত আবার বলিলেন, "যাবে না মা বাড়ীতে?—আমার 'আনন্দধাম' যে শূন্য অন্ধকার হয়ে আছে মণি! তোমার পিসীমা যে আকুল হয়ে পথ চেয়ে বসে আছে,—আমার সঙ্গে যাবে না, মা মণি?"

মণি মুখ তুলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে অশ্রুগাঢ় আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "কি করে যাব বাবা?"

সেই একটুখানি কথার মধ্যে যে দুহিতার অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন গভীর

ব্যথা ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়া যোগেশ্বর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের সহিত অজস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। উচ্ছ্বসিত আকুলকণ্ঠে কহিলেন, "তা'হলে আমি এখন চল্লুম মা, যেখানে যে ভাবে থাক, খবর দিতে ভুলো না। আর—যদি কখনও মৃত্যুশয্যায় পড়ে শেষ দেখা দেখ্‌তে চাই, তা'হলে হতভাগা বাপের শেষ অভিলাষ পূর্ণ করতে আসিস্ মা—"

সহনাতীত দুঃখে অভিভূত মুহ্যমান হইয়া যোগেশ্বর সমস্ত পথ মূক মূঢ়ের মত নীরবে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু গৃহে আসিয়া প্রতীক্ষমানা মহামায়াকে দেখিয়া তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি হৃদয়াবেগ দমনে অসমর্থ হইয়া, "আজ পাষাণে বুক বেঁধে আমার সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম দিদি!" বলিয়া অবোধ বালকের মত ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহামায়া কোনও মতে ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিতে পারিলেন না।

নব বরষার বারিধারা পাতে পুষ্ট স্ফীত হইয়া প্রসন্ন সলিলা ভাগীরথী আনন্দ উথলিত হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছেন। বাঁধান ঘাটের নিম্নস্থ সোপানগুলির উপর বার বার আছড়াইয়া পড়িয়া অশান্ত উদ্দাম তরঙ্গগুলি ক্রমাগত কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া যেন তাহাদের পুলক চঞ্চল প্রাণের অব্যক্ত হর্ষোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছিল।

কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা। আকাশে চাঁদ নাই। স্বল্প জ্যোতিঃ নক্ষত্রগুলি একটী একটী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া প্রিয়বিচ্ছেদ বিধুরা তামসী নিশীথিনীর বিরহ শয়নে জাগিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সন্ধ্যার ঘনায়মান

অন্ধকারে তাহাদের ক্ষুদ্র উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া ঝিক্ মিক্ ঝিক্ মিক্ করিতেছিল।

সেই সময় মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর যোগেশ্বর একাকী বসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ শান্তিহারা বিক্ষিপ্ত মন তখন শবদাহ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একাগ্র তন্ময় হইয়া গিয়াছিল।

ঐ যে একটী ধূ ধূ জ্বলন্ত চিতা, কি জানি কোন্ স্বল্পায়ু জীবের যত্ন পালিত দেহখানি ধ্বংস বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছে। নিকটেই আর একটী চিতায় একটী ক্ষুদ্র শবদেহ স্থাপিত করিয়া সবে মাত্র অগ্নি প্রদান করা হইয়াছে। রোরুদ্যমান হতভাগ্য আত্মীয়বর্গের শোক বিহ্বল অশ্রু-আর্দ্র দৃষ্টির সম্মুখেই সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিশিখা দীর্ঘ লক্ লক্ লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহাদের স্নেহের নিধিটীকে নিষ্ঠুর ভাবে—নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে!

আবার ওকি!—ঐ না কোন্ অভাগারা শোক মন্থর গমনে আর এক মৃত্যু পথ যাত্রীকে বহন করিয়া আনিতেছে, তাহাকে পরপারে পঁহুছাইয়া দিবার জন্য! গঙ্গাবক্ষে কে একজন খেয়া নৌকার মাঝি, যোগেশ্বরের আধ্যাত্মিক অনুভূতিপূর্ণ বিরাগী শ্রান্ত হৃদয়ের করুণ আকুল সুরে সুর মিলাইয়া উদাস গম্ভীর কণ্ঠে গাহিতেছিল, "মাঝ্ ধার নইয়াঁ মোরি,—পার লগা দে—"

সমস্ত বিশ্ব সংসার যেন একই সুরে বাঁধা। পারে পঁহুছিবার চিন্তা ও বিরাট ব্যাকুলতা, জলে স্থলে সর্ব্বত্রই ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু পারের পন্থা কোথায়,—কোন্ দিকে? ওগো প্রভু! ওগো বিশ্বের কর্ণধার! বলিয়া দাও এই পারের আকাঙ্ক্ষী জীর্ণ জীবন

তরীগুলি ভিড়িবে কোথায় গিয়া! কোথায় ইহাদের বিশ্রাম—কোথায় মুক্তি?

কূলহারা প্রবাহিনীর অর্থই অন্ধকার বক্ষে কে একটি সন্ধ্যা প্রদীপ ভাসাইয়া দিয়াছে, ঘন কম্পিত চঞ্চল জ্যোতিঃশিখাটুকু বুকে লইয়া অসহায় ক্ষুদ্র দীপ তাহার সঙ্গী সাথীহীন তমসাচ্ছন্ন দীর্ঘপথ বাহিয়া একাকী মৃদু শ্রান্ত গতিতে ভাসিয়া চলিয়াছে কি জানি কোথায়!—তাহার এই লক্ষ্য হীন অজানা অনির্দ্দেশ যাত্রার কোথায় শেষ, কোথায় তাহার সীমানা, হায়! কে বলিয়া দিবে?—একটা অজ্ঞাত গভীর বেদনা ও দারুণ বৈরাগ্যে পূর্ণ যোগেশ্বর কৃতাঞ্জলি পুটে বাষ্প গদ্গদ বচনে আত্মগত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় তুমি ওগো পারের কাণ্ডারী!—মোহ ঘোরে অন্ধ, মায়াজালে বদ্ধ অভাজনকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দাও প্রভু! বলে দাও কোন্ পথে গেলে এ দুস্তর ভব পারাবার পার হয়ে তোমার শান্তি শীতল মোক্ষ চরণে চিরশান্তি লাভ করতে পারব।"

"পারে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন বাবা? বড় কি শ্রান্ত হয়েছ?" কাহার জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া যোগেশ্বর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রজ্জ্বলিত চিতানলের প্রদীপ্ত আলোক শিখায় দেখিতে পাইলেন, তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া একজন দীর্ঘজটাজুটধারী সন্ন্যাসী,—পরিধানে রক্তাম্বর, প্রশস্ত ললাটে সিন্দুরের দীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্রক রেখা অঙ্কিত। এক হস্তে কমণ্ডলু অপর হস্তে তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ ত্রিশূল ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

সেই মহা গাম্ভীর্য্য ও বৈরাগ্য পূর্ণ পবিত্র শ্মশান ভূমিতে সেই মহাপুরুষাকৃতি সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দেখিয়া যোগেশ্বরের বেদনা মথিত উদাসী চিত্ত স্বতঃই ভক্তি শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়িল। ভক্তিভরে সাধুর

পাদবন্দনা করিয়া যোগেশ্বর ব্যথা বিগলিত গাঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা!—বড় শ্রান্ত হয়েছি! সংসারে দুঃখতাপে জ্বলে পুড়ে এ জীবন বড় দুর্ব্বহ অসহ্য হয়ে পড়েছে, এ বোঝা আর যে বহিতে পারি না বাবা! তাই তো শান্তির আশায় পারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"তারা মা'কে ডাক বাবা, তিনিই তোমাকে পারের সন্ধান বলে দেবেন। জয় মা তারা!—জয় মা কালী কুলকুণ্ডলিনী!" সুগম্ভীর নিনাদে নদী সৈকত মুখরিত করিয়া সন্ন্যাসী হুহুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই স্বল্পালোকে দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া যোগেশ্বরের মুখের পানে সন্দিগ্ধ ভাবে দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন, "কিন্তু তোমার ললাটে যে রাজ ঐশ্বর্য্য রাজ সুখ রয়েছে বাবা, তবে এ বৈরাগ্য কেন?"

যোগেশ্বর দুঃখক্লিষ্ট ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "রাজৈশ্বর্য্যে রাজসুখ ভোগে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে বাবা, সারাজীবন রাজভোগে কেটে গেল তবুও এ পাপ আত্মার তৃপ্তি তো হ'ল না! শুধু সুখের সন্ধানে মিছে মরীচিকার পিছনে ছুটোছুটী করেছি—কিন্তু আর তো পারি না বাবা,—বড় ক্লান্ত শক্তিহীন হয়ে পড়েছি যে—"

"শক্তি চাও?—তবে সেই শক্তিময়ীর শরণাপন্ন হও বাবা, তোমার শক্তিহীন মনে শক্তি পাবে। তারা মা'র দয়ায় এ দুঃখ তাপ, শ্রান্তি ক্লান্তি সমস্তই দূর হয়ে যাবে। তিনি যে অধম তারিণী!"

যোগেশ্বর একটা অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দে উল্লসিত হইয়া সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু! আজ হ'তে আপনি আমার দীক্ষা গুরু। এ অধমকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করতে পারবেন কি গুরুদেব?"

"ওঁ স্বস্তি! স্বস্তি!" প্রণত যোগেশ্বরের মস্তকে স্নেহভরে করস্পর্শ করিয়া সন্ন্যাসী কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে শিষ্যত্বে বরণ করব বলেই তো এসেছি বৎস! এ যে তাঁ'রই আদেশ! তাঁ'র আদেশ কি আমি অমান্য করতে পারি বাবা!"

সাধুর সেই পবিত্র কোমল করস্পর্শেই যোগেশ্বরের সমস্ত দুঃখ জ্বালা যেন এক নিমেষে জুড়াইয়া গেল। ভারগ্রস্ত অবসন্ন চিত্তের গভীর অবসাদ বিদূরিত হইয়া কোন্ এক মহান শক্তির প্রেরণায় মুহূর্ত্তে নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল।

শান্তি ও তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া যোগেশ্বর বলিলেন, "বুঝেছি, আপনি তা'হলে ঈশ্বর প্রেরিত হয়েই এসেছেন বাবা, আমার অসহ্য দুঃখের ভার লাঘব করতে তিনিই আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন!"

"সকলই সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বাবা, তাঁ'র ইচ্ছা বিনা কিছুই হ'তে পারে না।" বলিয়া ভাবমুগ্ধ সন্ন্যাসী সুললিত মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিলেন, "সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—"

সেই সুমধুর পবিত্র সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবাবেশে বিভোর যোগেশ্বরের বিমুগ্ধচিত্ত কি এক অভিনব অপরূপ পুলক রসে প্লাবিত হইয়া গেল।

তাঁহার লক্ষ্য ভ্রষ্ট দিশেহারা অন্ধকার জীবন সমুজ্জ্বল সুনির্ম্মল ধ্রুব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। যোগেশ্বর আনন্দে গদ্ গদ্ হইয়া পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তা'ই হ'ক্ বাবা, ইচ্ছাময়ী মা'য়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্। আজ হ'তে আপনি আমার দীক্ষ গুরু, আর এ অধম আপনার সেবক, দাসানুদাস মাত্র।

বাইশ।

"ওরে আমার সোনা! সোনাকে স্যাক্‌রা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা—

আমার চাঁদের কণা!

মুরলী গড়িয়ে দেব যত লাগে সোনা!

বাৎসল্য স্নেহে মুগ্ধা তরুণী মাতা ক্রোড়ে শায়িত ক্ষুদ্র শিশুটীকে আদর করিতে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল। জননীর সেই আদর ভরা সোহাগের বাণী বুঝিতে না পারিয়া অবোধ শিশু তাহার ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চক্ষু দুটী মেলিয়া মা'য়ের স্নেহনিষিক্ত কোমল মুখখানির পানে কেবল নীরবে পিট্‌ পিট্‌ করিয়া চাহিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া এক একবার তাহার গোলাপের পাপ্‌ড়ীর মত কোমলারক্ত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ দুখানি স্ফুরিত করিয়া মধুভরা সরল নীরব হাসি হাসিতেছিল।

প্রায় চারি মাস গত হইল, সুধীরের দুঃখের সংসার স্বর্গসুখে পূর্ণ করিয়া এই নন্দনের সুন্দর মন্দার কলিটী দেবতার আশীর্ব্বাদের মত মণিকার কোলে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

সুধীর বক্সারে একটী বে-সরকারী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে নিজের একান্ত চেষ্টার ফলে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইয়াছে। বেতন আশানুরূপ না পাইলেও সুধীর নিজের অবস্থায় বেশ সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল।

মণিকাও তাহার কষ্ট বা অস্বাচ্ছন্দ্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর কষ্টোর্জ্জিত

অর্থে ক্ষুদ্র সংসারের সকল অভাব ও অসুবিধা দূর করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইত। এখন স্বামীর মনস্তুষ্টিই তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য ও লক্ষ্যস্থল ছিল। প্রকৃত পক্ষে স্বামীকে মণিকা সুখী করিতে পারিয়াছিল নিশ্চয়, কিন্তু আপনি সুখী হইতে পারে নাই। প্রত্যাখ্যাত অবজ্ঞাত পিতার নিদারুণ মর্ম্ম পীড়া, যেন বিমুখ দেবতার নির্ম্মম অভিশাপের মত তাহার চারিদিকে সর্ব্বদাই ঘিরিয়া থাকিত, সেজন্ত স্বামীর অসন্তুষ্টির ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিলেও অনুশোচনার তুষানলে সে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছিল।

তথাপি সোণার চাঁদ শিশুটীকে বুকে পাইয়া মণির প্রাণের জ্বালা অনেকটা উপশম হইয়াছিল। তাহার হতাশ মনে আবার আশার সঞ্চার হইল, ক্ষুদ্র দেবদূতটী হয় ত বহুদিন বিচ্ছিন্ন পিতা-পুত্রীর পুনর্মিলনের হেতু হইয়াই শুভাগমন করিয়াছে! এ কারণে সাধারণতঃ সন্তানেরা মাতার কাছে যতখানি স্নেহাদর লাভ করে, মণির খোকাটী তাহাপেক্ষা অনেক বেশীই পাইয়াছিল।

পুত্রকে আদর করিতে মণি এতই নিবিষ্ট ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যে সুধীর কখন চুপি চুপি আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে তাহা জানিতেই পারে নাই।

সুধীর মুগ্ধ অপলকনেত্রে তাহার স্বর্ণ লতিকায় মুক্তার ফল দেখিতেছিল। প্রিয়তমার সেই অপরূপ স্নেহময়ী গণেশ জননী মূর্ত্তি সুধীর কতক্ষণ তদ্গদ চিত্তে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইয়া শেষে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আরে বাপ্ রে! আজ যে ছেলেকে ভারি আদর করার ঘটা পড়ে গেছে মণি! এদিকে

ছেলের জন্মদাতা যে কখন থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তা'র হুঁস্ পর্য্যন্ত নেই!"

মণিকা লজ্জিত চকিত হইয়া ত্রস্তে বলিল, "চুপি চুপি চোরের মত এসে দাঁড়ালে আর আমি কি করে জান্‌ব বল?"

পত্নীর সলজ্জ আরক্ত মুখখানির পানে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া সুধীর সহাস্যে উত্তর দিল, "আমি চোর হয়ে আসি নি মণি,—তোমার চুরী ধরব বলে এসেছি,—আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মায়ে পোয়ে রোজ বুঝি এমনি ধারা আদর আলাপ করা হয়? ও আবার কি? খোকার হাতে ও কি পরিয়েছ মণি?"

আশ্চর্য্যান্বিত সুধীর খোকার কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার ক্ষুদে ক্ষুদে কচি হাত দুখানির নূতন হীরার বালা এবং জড়োয়া কণ্ঠহার দেখিতে দেখিতে অধীর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ যে অনেক টাকার জিনিষ মণি, তুমি এসব কোথায় পেলে!"

স্বামীর প্রশ্নে মণির হর্ষ বিকশিত মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সে কুণ্ঠানত নেত্রে শুষ্ক স্বরে বলিল, "আজ যে খোকাকে দেখ্‌তে বাবা এসেছিলেন, তুমি তখন স্কুলে গিয়েছ, তা'ই--"

সুধীর গম্ভীর হইয়া বলিল, "ভাল করনি মণি এ সব নিয়ে,—তাঁ'র আশীর্ব্বাদই খোকার জন্যে যথেষ্ট ছিল। তিনি কোথায়?"

"ফিরে গেছেন, শুধু খোককে একটীবার দেখবার জন্যেই এসেছিলেন। কেন? এতেও কি তাঁ'র অপরাধ হয়েছে?"

সুধীর খানিক নির্ব্বাক থাকিয়া একটী ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না মণি, অপরাধ তাঁ'র হয়নি, কিন্তু আমাদের হয়েছে বই কি?

যাঁ'কে এতদিন ইচ্ছে করেই নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয়ের মত দূরে ঠেলে রেখেছি, একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়েও বাধ্য হয়ে যাঁ'র সঙ্গে পরের মত ব্যবহার করেছি, তাঁ'রই কাছে ছেলের জন্যে এই ভিক্ষা গ্রহণ করা—"

মণিকা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "একি কথা বল গো? একি ভিক্ষে নেওয়া হ'ল?—বাবা কত সাধ করে নিজের হাতে নাতিকে পরিয়ে দিলেন, আমি কেমন করে, কোন প্রাণে তাঁ'কে বারণ করি বল?"

মণিকার অপ্রতিভ বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া সুধীরের মন করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে মনে মনে অনুতপ্ত হইয়া পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, "তা বেশ করেছ মণি, বারণ করিনি। কেন বাপু, অত বড় রাজা মাতামহর কাছে খোকা কি কিছুই পাবে না? আরে বাহবা! দেখ দেখ, ব্যাটা বড্ড তো হাসতে শিখেছে!"

সুধীর পুলকিত হইয়া উচ্ছ্বসিত গভীর স্নেহে খোকার হাসিভরা কচি মুখখানি বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল।

"আহা হা! কর কি? বেচারার মুখখানা যে তুমি একেবারে লাল করে দিলে গা?"

সুখে পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া মণিকা হাসিতে হাসিতে সুধীরের মুখ খোকার কাছ হইতে সরাইয়া দিল। তাহার পর কৌতুকের সহিত বলিল, "কাপড় ছেড়ে খাবার টাবার খাবে, না শুধু চুমু খেয়েই পেট ভরাবে?" খোকাকে বিছানায় শোওয়াইয়া মণিকা স্বামীকে খাবার দিতে গেল।

রাত্রির নিশ্চিন্ত অবসরে মণিকা এক সময় পিতার প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিল, "দেখ, বাবাকে আজ কদ্দিন পরে দেখলুম, কিন্তু এমনটী যে দেখব তাঁ'কে, তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।"

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ভারি রোগা হয়ে গেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ রোগা তো হয়েইছেন, তা'ছাড়া আরো—"

মণিকে থামিতে দেখিয়া সুধীর সাগ্রহে বলিল, "তা ছাড়া কি মণি?"

খানিক স্তব্ধ থাকিয়া মণিকা একটী ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বাবা যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন, শুধু শরীরে নয়, মনেও তাঁ'র আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আর আমাদের ওপর সে রকম টানও যেন নাই বোধ হ'ল, শুধু পিসীমার আগ্রহেই নাকি খোকাকে আজ দেখ্তে এসেছিলেন। অথচ এই বাবাই আগে—" রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া মণিকা বলিতে লাগিল, "মান অপমানের ভয় না করে, এই বাবাই একদিন গাজিপুর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, এরি মধ্যে এমন বদলে গেলেন যে কি করে তা বুঝতে পারলুম না।" বলিতে বলিতে অভিমানিনী মণির চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তাহাকে আদর করিয়া সুধীর সস্নেহ হাস্যে কহিল, "বাস্তবিক, তুমি কিন্তু ভারি "সেন্টিমেণ্ট্যাল" মণি, এবার বাবা নিয়ে যাবার জন্যে আগ্রহ করেন নি বলেই বুঝি তোমার মনে এমন ধারণা হয়ে গেল? কিন্তু তুমি যে তাঁ'কে দু দুবার ফিরিয়ে দিয়েছ, সে কথা কি ভুলে গেছ?"

স্বামীর এই প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া মণি বলিল, "না না, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না। বাবা নিয়ে যেতে চাইলেই কি আমি তোমার অমতে যেতে পারতুম? তা নয়, তুমি যদি

বাবাকে একটীবার স্বচক্ষে দেখ্তে, তা'হলে বুঝতে তাঁ'র কি রকম অবস্থা।"

সুধীর আর কিছু বলিতে পারিল না। পিতা-পুত্রীর এই নিদারুণ মনস্তাপের কারণ যে সে নিজেই, তাহাতে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আত্মগ্লানি ও পরিতাপে পূর্ণ হইয়া সুধীর তাহার বুদ্ধিকে শতবার ধিক্কার দান করিল।

তেইশ।

মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগেশ্বর সেদিন দৈবাৎ যে সাধু মহাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কাশীধামের স্বনামখ্যাত শক্তিসাধক কালিকানন্দ স্বামী। স্বামীজীর কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে ও প্রকৃত সদ্‌গুরুর কৃপায় যোগেশ্বর তাঁহার সাধন পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

তাঁহার সংসারের একটী মাত্র বন্ধন ছিল মণিকা, সে আজ নিজের পথ বাছিয়া লইয়া পিতাকে চিরদিনের মত মুক্তি দিয়া গিয়াছে। তবে আর সংসার ধর্ম্ম, অর্থ উপার্জ্জন কাহার জন্য? কিসের জন্য? মায়াময়ীর অচ্ছেদ্য মায়াজাল হইতে মুক্ত হইবার বাধাহীন অবসর পাইয়া যোগেশ্বর তাহা হেলায় হারাইবেন কেন?

উদাসীন যোগেশ্বর তাঁহার অর্থরাশি সাধু সেবা ও ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত করিয়া নিজে প্রকৃত ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত ব্রহ্মচর্য্যের কৃচ্ছ্র সাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। কোনও দিন এক বেলা হবিষ্যান্ন কোন দিন শুধু ফল মূলাহার, মাঝে মাঝে নিরম্বু উপবাসও চলিতে লাগিল। এই কঠোর নিয়মে থাকিয়া তাঁহার চিরদিনের সুখ পুষ্ট সবল দেহখানি ক্রমশঃই কৃশ শীর্ণ হইয়া উঠিল দেখিয়া মহামায়া বিলক্ষণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তাঁহার কোথায়? ঐহিক সুখভোগে বিগতস্পৃহ ভ্রাতা শান্তিহীন জীবনে শান্তিলাভের

আশায় আজ যে দুর্গম পথের পথিক হইয়াছেন সে পথ হইতে তাঁহাকে টানিয়া ফিরাইতে পারে শুধু একজন, কিন্তু সে আজ কোথায়! সংসার সুখে অপরিতৃপ্ত নিরলম্ব নির্ব্বান্ধব পিতাকে একাকী ফেলিয়া, মায়া মমতা সব বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্ঠুরের মত সে যে দূরে—বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে, শত সাধনাতেও সে তো আর আসিবে না!

কিন্তু যোগেশ্বর যখন তাঁহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ দুই হাতে জলের মত বিলাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন মহামায়া আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি গৃহধর্ম্মে উদাসীন, পরমার্থের চিন্তায় বিভোর ভ্রাতাকে আর এক নূতন বন্ধনে বাঁধিবার উপায় মনে মনে স্থির করিয়া এক সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

কাল অমাবস্যা, সমস্ত রাত্রি উপবাস গিয়াছে। মধ্য রাত্রে সামান্য নিদ্রার পর, যোগেশ্বর প্রাতে উঠিয়া তাঁহার নিভৃত কক্ষে অজিনাসনে উপবেশন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পাঠ করিতেছিলেন।

প্রভাতের নির্ম্মল পুণ্যালোক সেই সাধকের উপবাস ক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে পতিত হইয়া এক অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে, সে পবিত্র মূর্ত্তি পুরাকালের তপঃ কৃশ মুনি ঋষিদিগের সহিত উপমেয়। মহামায়া ভ্রাতার পানে চাহিয়া স্নেহ সকরুণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "যোগু"!

যোগেশ্বর পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া উত্তর দিলেন, "কি বলছ দিদি?"

"কাল যে সারারাত উপোস গিয়েছে, এখনও মুখে জলটুকু দেওনি, সে কথাও কি মনে নেই যোগু?"

ভগিনীর সস্নেহ অনুযোগে একটুখানি অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া

যোগেশ্বর কহিলেন, "খাবার জন্যে এত তাড়া কিসের দিদি? তুমি যে সমস্ত দিনরাত নির্জ্জলা একাদশী করে থাক, বারো মাস তিরিশ দিন, আর আমি যদি—"

মহামায়া বাধা দিয়া বলিলেন, "পাগল! আমি আর তুমি কি সমান ভাই?"

"সমান নয় কিসে দিদি—আমি পুরুষ এইটুকুই প্রভেদ তো?"

মহামায়া ভ্রাতার বিপর্য্যস্ত রুক্ষ কেশরাশিতে হস্তার্পণ করিয়া একটু কুণ্ঠার সহিত বলিলেন, "আমার একটা কথা তুমি রাখবে যোগু?"

কি কথা তাহা জানিবার জন্য যোগেশ্বর মহামায়ার মুখপানে চাহিতেই মহামায়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, "জামায়ের মত যখ এখনো ফিরল না, তখন আমি বলি কি যোগু, তুমি বিয়ে থাওয়া করে ফের—"

অতিমাত্র বিস্ময়ে চক্ষু বিস্তারিত করিয়া যোগেশ্বর বলিলেন, "ফের বিয়ে করব? বল কি দিদি? এই বয়সে শ্মশানঘাটের দিকে পা বাড়িয়ে—"

"ষাট্! ওকি কথা যোগু?—কেন? এ বয়সেও লোকে বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হচ্ছে না কি? তা—যাক্‌গে, বিয়ে না হয় নাই করলে, তবু সংসারে থাক্‌তে গেলেই মানুষের একটা উপলক্ষ্য চাই তো—আমি বলি একটী বেশ সৎবংশের ছেলে পুষ্যি নিয়ে—"

যোগেশ্বর প্রত্যুত্তরে সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "পাগল হয়েছ দিদি? আমার মণিকার অধিকার আমি প্রাণ থাক্‌তে আর কাউকে দিতে পারব না। আর পরের ছেলে যে আপন হ'তে পারে না, তা'তো

আমাদের সুধীরকে দিয়েই দেখলে দিদি! তবে আর ও সব পরামর্শ দাও কোন্ হিসেবে? থাক্ এখন ও সবে আর কাজ নেই, আমি বেশ তো শান্তিতে আছি দিদি! তারা মা যখন নিজের হাতে আমার সকল বাঁধন খসিয়ে দিয়েছেন, তখন আবার নূতন করে মায়াজালে জড়াবার চেষ্টা কেন?"

মহামায়া কতক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু এত বড় বিষয়টা কি শুধু পাঁচভূতে লুটে খাবে?"

যোগেশ্বর ক্ষুব্ধ হাস্যে কহিলেন, "পঞ্চভূতেই যে ভগবান বিরাজ করছেন দিদি, সে কথা ভুলে যাও কেন?"

"কিন্তু সংসার যে ছারখারে যাচ্ছে, কে দেখে বল দিকি?"

যোগেশ্বর সদুঃখে বলিলেন, "এখনও সেই পোড়া সংসারের ভাবনা! থাক্‌বার মধ্যে আমরা দুটী ভাই বোন, তা দুজনেই সংসারের দেনা পাওনা চুকিয়ে পথের ধারে এসে বসে আছি, তবে আর কা'র জন্যে ভেবে মরি বল? যে কটা দিন বেঁচে আছি, পরকালের কাজ করে যাই, তারপর বিষয় আশয় যার সেই পাবে, আমি তো কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যাব না দিদি!"

নিরুপায় মহামায়া মনে মনে আর এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা সুধীর যেন পরের ছেলে, তা'র কথা ছেড়ে দাও, মণি তো তোমার পর নয়, তা'র যে সেই গুঁড়োটুকু হয়েছে তাকে—"

"আহা! সেও যে পরের ধন দিদি, নইলে আমার কত দুঃখের মণি, তা'র সন্তান, তা'কে কি না শুধু চক্ষের দেখা দেখে চলে আস্‌তে হ'ল! মনের সাধ মনেই রইল, কই আমার সৃষ্টিধর বংশধরকে,

আমার বুক জোড়া মাণিকধনকে আমি বুকে করে ঘরে আন্তে পারলুম না তো ?”

যোগেশ্বরের চক্ষু সজল, কণ্ঠস্বর আদ্র কম্পিত হইয়া উঠিল। আর কোনও সান্ত্বনার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া মহামায়া অগত্যা বলিলেন, “কিন্তু সুধীরের সঙ্গে একবারটী দেখা করে এলে বুঝতে পারতে তা'র এখনকার মনের গতিক কি রকম, সন্তান এমন জিনিস নয় যোগু—”

“না দিদি ! জামাইয়ের হাতে বার বার অপমান সহিবার মত ধৈর্য্য আমার নেই। তা'র মনের ভাব পরিবর্ত্তন হ'লে মণি কি আমায় জানাত না ? যাক্, তা'রা নিজের অবস্থায় সুখে আছে সেই আমার সুখ,—মিছে টানাটানি করে আর কি হবে বল ?”

* * * *

মাস দুই পরের কথা। সুধীর আহারাদির পর স্কুল গিয়াছে। মণিকা খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া তাহারই জন্য মোজা বুনিতেছিল। কিন্তু আজ আর সে কোনও কাজেই মন দিতে পারিতেছিল না। মণি তাহার পিতার সংবাদ.কতদিন পায় নাই, তাই মনটা বড় উতলা হইয়া উঠিয়াছে, কি জানি তিনি কেমন আছেন ! পিসীমাও কি তাঁহার অত আদরের মণিকে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন ? নহিলে নিজে লিখিতে না পারিলেও অন্য কাহারও দ্বারায় একখানি পত্র লিখাইয়া একটা সংবাদ দিতে পারিতেন নাকি ? কিন্তু অবোধ মণি এ কথা ভাবিল না যে, সে নিজেই তাঁহাদের প্রাণঢালা স্নেহাদর অবহেলা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে !—

হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া মণিকা তাহার সম্মুখের চিক্ ফেলা

জানালার দিকে অন্যমনস্ক উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই দিক দিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার পথ। পথের উপর দিয়া মোট ঘাট লইয়া কত যাত্রী আনা গোনা করিতেছে। পদব্রজে, ঘোড়া গাড়ীতে, এক্কায়, সাইকেলে করিয়া যে যাহার গন্তব্য পথে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কাহারও মুখে শুধু ব্যস্ততা, কাহারও উদ্বেগ, কাহারও বা আনন্দ উচ্ছল ভাব মুখে চক্ষে স্পষ্ট জাগিয়া উঠিযাছে। কত সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা লইয়া ইহারা কে কোথায় কিসের জন্য চলিয়াছে কে জানে?—ইহাদের মধ্যে একখানি চিরপরিচিত স্নেহভরা মুখ দেখিবার জন্য মণির অশান্ত চিত্ত আরও অধীর হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, এই পথ দিয়া একদিন তাহার বাবাও আসিয়াছিলেন, ঠিক এই সময়টীতে। তাঁহার অতর্কিত আগমনে মণি বিস্ময়ে আনন্দে প্রথমটা কিরূপ বিহ্বল বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল! পিতাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার আদর ভরা স্নেহ সম্ভাষণ শুনিয়াও মণি কতক্ষণ প্রত্যয় করিতে পারে নাই যে, তাহার দীনকুটীরে পিতা সত্য সত্যই আসিয়াছেন! ব্যাপারটা যেন আগাগোড়া স্বপ্ন বলিয়াই ভ্রম হইতেছিল। সেই রকমটী যদি আজও হয়! হায় রে! মানুষের দুরাশা!—ঐ যে একখানি পাল্কীগাড়ী জিনিস পত্রে বোঝাই হইয়া রাস্তার মোড় ঘুরিয়া তাহাদের বাসার দিকেই আসিতেছে না? কিন্তু গাড়ীর দরজা বন্ধ কেন? কিছু বুঝিতে না পারিয়া মণিকা তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে ছুটিল, শুনিতে পাইল কে স্ত্রীকণ্ঠে বলিতেছে, "এটাই তো সুধীর বাবুর বাসা—ঠিক জান তো বাছা?" সে স্বর যেন মণিকার চিরপরিচিত।

শশব্যস্তে দ্বার খুলিয়া মণি উচ্ছ্বসিত হইয়া ডাকিল, "পিসীমা!"

মহামায়া বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করিতেই মণি একেবারে তুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। অভিমান ভরা স্বরে সাশ্রুনয়নে অনুযোগ করিয়া বলিল, "এতদিনে তোমার মণিকে মনে পড়ল পিসীমা? আমি বলি, বুঝি একেবারেই ভুলে গেছ! আমার বাবা কেমন আছেন পিসীমা?"

"থাম মা বলছি সব, আগে ঘরে চল।"

মণি পিসীমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বসো পিসীমা, আগে গাড়ী থেকে তোমার জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে নেই, কিন্তু বাড়ীতে এখন চাকর বাকর কেউ নেই যে। তুমি গাড়োয়ানকে বলে দাও না পিসীমা—"

মহামায়া বলিলেন, "না মা, জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ী এখন এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, এই ঘণ্টা তুয়েক পরেই তো আবার কল্‌কেতার ট্রেণ ধরতে হবে।"

"এরি মধ্যে যাবে পিসীমা? কিন্তু কল্‌কেতায় কেন? কাশীতে যাবে না?"

"না মা! বাবা বিশ্বনাথ মাথায় থাকুন। আমার কাশীবাসের সাধ ভাল করেই মিটে গেছে! এবার নৈহাটীতে গিয়ে থাক্‌ব মনে করছি।"

নৈহাটীতে মহামায়ার শ্বশুরালয়। সেখানে আত্মীয় কুটুম্ব যথেষ্ট থাকিলেও মহামায়া বহু দিন হইল, মণিকার জন্মের পূর্ব্বেই, শ্বশুরালয় হইতে চিরবিদায় গ্রহণান্তর অবশিষ্ট জীবন হিন্দুর প্রধান তীর্থ কাশীধামে অতিবাহিত করিবার মানসে ভ্রাতার গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু এতকাল পরে তাঁহার সে সংকল্প বিচলিত হইয়াছিল। কেন, তাহাই বলিতেছি।

পিসীমাকে ঘরে লইয়া গিয়া মণিকা বলিল, "বসো পিসীমা, আমি আজ তোমাকে কোনও মতেই ছেড়ে দেব না, তা বলে দিচ্ছি।"

"না মা! আমাকে এখনই ফিরতে হ'বে, আর এক দণ্ডও দেরি করতে পারব না। শুধু তো'কে দুটো কথা বলতেই এসেছিলুম আমি—হ্যাঁ রে! এই বুঝি তোর ছেলে?—আহা! ভারি তো সুন্দর হয়েছে দেখ্তে—মুখখানি যেন অবিকল তো'র মত।" মহামায়া পরম আগ্রহে ঘুমন্ত খোকাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। আদরে তাহার কচিমুখ চুম্বন করিয়া মহামায়া আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা গো! এমন ঘর আলো করা সোণার মাণিক থাক্‌তে কি না যোগু আমার একবিন্দু স্নেহের কাঙাল হয়ে ছন্নছাড়া বিবাগী হয়ে গেল!"

মণিকা উদগ্রীব হইয়া শঙ্কিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন পিসীমা তুমি এমন কথা বলছ? বাবার কি হয়েছে? তিনি কি ভাল নেই?"

মণিকার ব্যগ্র ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে পিসীমা একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সখেদে বলিলেন, "আর ভাল! তোর বাবা কি আর সে মানুষ আছে রে মণি তাঁ'র সে শরীরও নেই, সে মনও নেই। একবার দেখ্‌লেই বুঝতে পারবি, সে কি ছিল আর কি হয়ে গিয়েছে!"

মণিকা অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া অধীর কণ্ঠে কহিল, "আমার বাবার কি হয়েছে তা বল না পিসীমা! আমি যে তোমার কথার মানে কিছুই বুঝতে পারছি না!"

মহামায়া তখন ভ্রাতার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কাহিনী মণিকার সাক্ষাতে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শুনিতে শুনিতে দুঃখে ক্ষোভে অনুশোচনায় মণিকার ব্যথিত হৃদয়খানি যেন শতধা বিদীর্ণ

হইবার উপক্রম হইল। হায় রে অদৃষ্ট! কত জন্মজন্মান্তরে মহাপাতকের ফলে, কোন্ হৃদয়হীন বিমুখ দেবতার নিষ্ঠুর অভিশাপে সে বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! পিতা মাতার সর্ব্বনাশ করিতে, সুখের ঘরে আগুণ দিতেই বুঝি বাঙ্গালার অভাগা কন্যা সন্তানগুলিকে বিধাতা সংসারে পাঠাইয়া থাকেন?—চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া মণিকা ধরা গলায় বলিল, "কিন্তু এ সময় তুমিও বাবাকে ছেড়ে যাবে পিসীমা? তাঁ'কে কে দেখবে?"

পিসীমা অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আমি থেকেই বা কি করব মা? সে ত আমার একটী কথাও রাখছে না। দিনে দিনে তিলে তিলে চক্ষের সামনে আত্মহত্যা করছে, তা'র এ দশা কেমন করে দেখি বল? এতো পাতান সম্পর্ক নয় মণি, মায়ের পেটের ভাই, তা'ও পাঁচটী নয় সাতটী নয়, ঐ একটী মাত্র—" মহামায়া বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মণিকাও চক্ষের জল রাখিতে পারিল না, তাহার স্নেহময় পিতার জন্য সে যে একদিনও মায়ের অভাব জানিতে পারে নাই, সেই পিতার আজ এই অবস্থা শুধু তাহার জন্যই তো?

পিসীমা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "এমন ধারা অত্যাচার অনিয়ম আর কতদিন সইবে বল? আমার ভয় হয়, যোগু হয় তো পাগল হয়ে যাবে, নয় তো বাড়ী ঘর ছেড়ে শেষে শ্মশানবাসী হবে। কিছুই আশ্চর্য্য নয় তা'র।"

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া মণিকা অধীর কাতর স্বরে বলিল, "তা' হ'লে কি হবে পিসীমা? বাবাকে কি করে বাঁচান যায়?"

"বাঁচাতে তোমরাই পারবে মা, নইলে আর কারুর সাধ্য নেই, ওকে ধরে রাখ্‌তে। আমি তো হার মেনে চল্লুম—এখন তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা কর।"

মণিকা মিনতি করিয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি পিসীমা! আজকের দিনটী শুধু—থেকে যাও, তুমি, তোমার মুখে এ সব কথা বল্লে উনি আর না বল্‌তে পথ পাবেন না।"

মহামায়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, "না মণি, আমার বলাটা ভাল দেখায় না, তা'র চেয়ে তুমি নিজেই জামাইকে বুঝিয়ে বলো,—বলো এ সময় মান অপমান মনে না রেখে সেখানে গিয়ে না পড়লে আর যোগুর রক্ষে নেই, তোমাদেরও মঙ্গল নেই মা! অত বড় রাজার বিষয় কি এম্নি করেই ছারখারে যাবে? অন্ততঃ ঐ কচি ছেলেটার ভবিষ্যত ভেবেও যে তোমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।"

মণিকা কুণ্ঠিত সঙ্কোচে কহিল, "যাব পিসীমা! যেমন করে পারি যাব।"

পিসীমা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তাই যাস মা,—আহা! এই সোণার পুতুল কোলে পেলে যোগুর কি আর কিছু মনে থাক্‌বে? দিনরাত বুকে বুকে গলার হার করে রাখবে।—হ্যাঁ রে ছেলের মুখে ভাত দিয়েছিস মণি?"

মণিকা সলজ্জ মুখে হাসিয়া বলিল, "না পিসীমা, কে দেবে ভাত?"

"বেশ, তা একেবারে কাশীতে গিয়েই খোকার অন্নপ্রাশন হ'বে এখন। তোর বাবা দেখিস কত ঘটা করবে,—সে নাতির ভাতে সমস্ত কাশী সহর তোলপাড় না করে আর ছাড়বে না। আহা! মণির ছেলে,

তা'র যে বড় দুঃখের বড় আশার ধন!" পিসীমার ব্যথা সজল চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল গড়াইয়া সুপ্ত খোকার মুখের উপর পড়িল। নিদ্রিত শিশু চমকিয়া উঠিল। "ষাট ষাট! মাণিক আমার! সোণার যাদু আমার! মা'র কোল জোড়া হয়ে বেঁচে থাক,—রাজ রাজ্যেশ্বর হও।"

উদ্বেলিত স্নেহে পুনর্ব্বার মুখচুম্বন করিয়া মহামায়া বলিলেন, "তা'হলে কথাটা মনে রাখিস মা! সন্তান হয়ে জেনে শুনে বাপকে ঘরছাড়া উদাসী হ'তে দিস্‌নে। তা'কে জোর করে ঘরে রাখিস।"

মণিকা বিপন্নভাবে কহিল, "কিন্তু যদি আমার কথা না শোনেন তা'হলে! তুমিও আমাদের সঙ্গে ফিরে চল না পিসীমা!"

মহামায়া আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না মা! সে আর হয় না। আমি যে এখানে তোমাদের বল্‌তে এসেছি, এ কথা ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারলে যোগু বড় রাগ করবে। আমার সমস্ত যত্ন তা'হলে পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। তা'র স্বভাব যে এখন কত বদ্‌লে গেছে, তা'তো জান না মা! অত যে মায়া তা'র, কোথায় চলে গেছে!"

চব্বিশ

স্কুলে ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের শুভাগমনোপলক্ষ্যে সে দিন সুধীরের বাড়ী ফিরিতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সারাদিনের কর্ম্ম-ক্লান্ত সুধীর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ধূলিলাঞ্ছিত দেহে যখন গৃহে পঁহুছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ভেজান দুয়ার ঠেলিয়া সুধীর সবিস্ময়ে দেখিল, বাড়ীতে তখনও সন্ধ্যা জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার ঘরের ভিতর হইতে শুধু ক্রীড়ারত খোকার অস্ফুট মধুর কাকলী-ধ্বনি শোনা যাইতেছে, আর কাহারও সাড়া শব্দ নাই। কিছু আশ্চর্য্য হইয়া সুধীর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, খোকা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হাত পা ছুড়িয়া সন্তরণের অভিনয় করিতেছে, আর তাহার গর্ভধারিণী অদূরে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া পাশ ফিরিয়া নিঃশব্দে শুইয়া আছে।

মণিকার এ ভাব ছলনা মনে করিয়া সুধীর সহাস্যে বলিল, "বারে! আজ একটুখানি ফিরতে দেরি হয়েছে, আর অমনি ঠাক্‌রুণের গোঁসা করে শুয়ে থাকা হ'ল? আমি তো বলেই গিয়েছিলুম আজ ফিরতে দেরি হবে। ইন্‌স্পেক্টার খুব খুসি হয়ে গেছে মণি—দেখ যদি আমাদের মাহিনা কিছু বাড়িয়ে দেয় —" মণি তখনও নীরব নিঃসাড়। সুধীর অগত্যা "হ্যাঁ রে ব্যাটা! সাঁতার দিতে শিখ্‌ছিস নাকি?" বলিয়া পুত্রটীকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে করিতে পত্নীর পাশে বসিয়া বলিল, "কি হ'ল গো? এমন অসময়ে শুয়ে কেন? অসুখ টসুখ করেনি তো?" তারপর মণির গায়ে হাত দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "নাঃ! গা তো বেশ

আছে। তবে কি? হ্যাঁ গো মানময়ী! এই কি তোমার মান করে পড়ে থাকবার সময়? এ দিকে ক্ষিদের জ্বালায় আত্মারাম যে কণ্ঠাগত হ'ল! শীগগির ওঠ, নইলে আমরা বাপ ব্যাটায় বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।" মণিকা তথাপি নীরব। ছেলেকে তাহার জননীর পাশে শোয়াইয়া দিয়া সুধীর রঙ্গ করিয়া বলিল, "নাঃ! মানভঞ্জনের পালা না কর্‌লে আর উঠছ না দেখ্‌ছি,—তা'হলে আরম্ভ করি,—

ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নম্—
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী—"

বলিতে বলিতে সুধীর জোর করিয়া মণিকার মুখের আভরণ সরাইয়া দিয়া দেখিল, মণিকার সুন্দর মুখখানি প্রভাতের শিশিরঝরা কমলের মত আর্দ্র আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উদ্বেগে ব্যাকুল হইয়া সুধীর ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি! তুমি কাঁদছ মণি? ব্যাপার কি বল তো?"

মণি কথা কহিতে পারিল না, স্বামীর সহানুভূতি ও আদর পাইয়া তাহার উপচাইয়া পড়া চক্ষের জল দ্বিগুণ বেগে বহিতে আরম্ভ করিল।

সুধীর শঙ্কিত কাতর চিত্তে বলিল, "বল না মণি কি হয়েছে? লক্ষ্মীটী আমার!"

অনাহূত অবাধ্য অশ্রুধারা দুই হাতে মুছিতে মুছিতে মণিকা উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল। তাহার পর বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মুখ হাত ধোও, আমি খাবার দিইগে।"

সুধীর তাহার হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া উদ্‌গ্রীব ভাবে কহিল,

"না মণি! আগে তুমি বল কি হয়েছে, নইলে আমি আজ জলস্পর্শও করব না।"

মণি কাতরতার সহিত বলিল, "হ'তে আর বাকি কি আছে বল? আমার পাপের ভার পূর্ণ হ'তে আর দেরি নেই।"

সুধীর ব্যথিত হইয়া বলিল, "তুমি আজ এ সব কি বলছ মণি? তুমি যদি পাপী, তবে এ জগতে পুণ্যাত্মাটা কে, তাও তো জানি না—"

"না গো! আমার মত পাপিষ্ঠা এ জগতে আর দুটী নেই! নইলে যে বাপ সংসারের সকল সুখভোগ জলাঞ্জলি দিয়ে, আমাকে এতকাল বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করলেন, সেই সর্ব্বভোলা সদাশিব বাপের বুকে বাজ হেনে তাঁর সর্ব্বনাশের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালুম শেষে? এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি জন্মজন্মান্তরেও করে উঠতে পারব না!"

ব্যাপার কতকটা বুঝিয়া লইয়া সুধীর অপ্রতিভ হইয়া অপরাধীর ভাবে কহিল, "আজ কি কিছু নূতন খবর পেলে নাকি?"

"হ্যাঁ, পিসীমা এসেছিলেন যে। তাঁ'র মুখে যে রকম শুনলুম, তা'তে বাবা যে আর বেশী দিন থাকেন তা তো বোধ হয় না।"

"কেন? কেন? তাঁ'র কি অসুখ হয়েছে নাকি?"

মণিকা ব্যথিত অন্তরে পিতার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা সংক্ষেপে জানাইয়া ব্যথাহত করুণকণ্ঠে কহিল, "এখনো সময় আছে, চল দুজনে বাবার পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষে করিগে, নইলে ধর্ম্মের কাছে, জগতের কাছে, আমাদের যে চির অপরাধী হয়ে থাক্‌তে হবে।"

মণিকার, যত্নরুদ্ধ অশ্রুরাশি পুনরায় উথলিয়া পড়িল। সুধীর খানিক নির্ব্বাক স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার পর সংশয় জড়িত দ্বিধার

সহিত বলিল, "কিন্তু মণি! বাবা সেদিন যখন খোকাকে দেখ্‌তে এসে ছিলেন, তখন আমাদের যাবার কথা বল্লেই তো পারতেন—তা বলেননি, তা'ই ভাব্‌ছি আমাদের হঠাৎ এমন করে যাওয়াটা কি ভাল হবে?"

"বলবার মুখ কি তুমি রেখেছ তাঁ'র? কিন্তু এখন আর ভাল মন্দ ভাববার সময় নেই, চল দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি, নইলে শেষে পস্তাতে হবে।"

"কিন্তু মণি--"

এবার মণির ধৈর্য্য রক্ষা কঠিন হইয়া পড়িল, সে কান্না ভাঙ্গা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আবার কিন্তু কি? ওগো! তোমার প্রাণ কি সত্যিই পাষাণে গড়া? এত বড় বিপদের কথা শুনে অতি বড় শত্রু যে, তা'রও মনে যে দয়া না এসে থাক্‌তে পারে না! আর তুমি তাঁ'র জামাই হয়ে স্বচ্ছন্দে নিজের গোঁ ধরে বসে থাকবে? কিন্তু আমি যে একবারটী না গিয়ে থাক্‌তে পারব না, পোড়া মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে বাপের ওপর কি আমার কোনও কর্ত্তব্যই নেই?"

সুধীর শশব্যস্তে বলিল, "না মণি! কর্ত্তব্য তোমারও আছে, আমারও আছে, তোমাকে নিয়ে যেতে আমি এখনি প্রস্তুত, কিন্তু ভাবনা আমার চাকরীর জন্যে কত কষ্টে যে এই চাকরীটুকু যোগাড় করেছিলুম জানই তো?"

মণিকা অবজ্ঞাভরে কহিল, "রেখে দাও তোমার চাকরী! যার অন্ন দশে খেয়ে ফুরুতে পারে না, তা'র আবার চাকরীর ভাবনা? আমি কিন্তু তোমার কোনও ওজর আপত্তি শুনছি না, আজ তো সময় নেই কিন্তু কালই যদি না চল তা'হলে—"

মণিকে প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া সুধীর বলিল, "এত ব্যস্ত হয়ো না লক্ষ্মী, এখানকার একটা ব্যবস্থা করে না গেলে যে বড়ই আহাম্মকী করা হবে। আবার তাঁ'র যে রকম মতি গতির কথা শুনলুম তা'তে ভয় হয়, যদি আমাদের আবার এইখানেই ফিরে আসতে হয়,— তখন কি হবে বল? অনিশ্চিতের আশায় নিশ্চিতকে ত্যাগ করা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয় মণি!"

স্বামীর কথাগুলির মধ্যে একটা সত্যের আভাস পাইয়া মণিকা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার স্নেহ সর্ব্বস্ব কন্যাগত প্রাণ পিতা কি প্রকৃতই এমন নির্দ্দয় হইবেন? অবোধ সন্তানের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ কি সত্যই তিনি মার্জ্জনা করিতে পারিবেন না? কিন্তু আজ যদি মণির মা বাঁচিয়া থাকিতেন! তাহা হইলে কি এমন অঘটন ঘটিতে পারিত? আজ কতকাল পরে মায়ের অভাব মনে করিয়া মণিকা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিল।

স্ত্রীর একান্ত আগ্রহ ও অনুরোধ উপরোধে সুধীর শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শ্বশুরকৃত অপমান সে তখনো ভুলিতে পারে নাই। তাহার উপর নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া আজকাল করিয়া নানা ছুতায় সে কাশী যাত্রার বিলম্ব করিতেছিল। নিরুপায় মণিকা উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া তেত্রিশকোটী দেবতার নিকট স্বামীর সুমতি প্রার্থনা করিতেছিল।

আষাঢ়ান্তের মেঘাচ্ছন্ন দীর্ঘ বেলা; আকাশের অবস্থা বিরক্তিকর। সারাদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িয়া পথের কাদা ও পথিকের মনের নিরানন্দভাব বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছিল।

সুধীর ক্লাসে বসিয়া তাহার ছাত্রদের পাঠ বলিয়া দিতেছিল, এমন সময় স্কুলের চাপরাসী আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া জানাইল বাহিরে একটী ভদ্রলোক তাঁহার দর্শন প্রার্থী।

এই দুর্য্যোগের মধ্যে ভদ্রলোকের আগমন বার্ত্তা পাইয়া সুধীর কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাহিরে গিয়া দেখিল, টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়া বিনয় বিরক্তি গম্ভীর মুখে দণ্ডায়মান।

"হ্যাল্লো! বিনয় নাকি!" ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সুধীর বিনয়ের হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া আসিল। হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিল, "কি ভাগ্যি! এতকাল পরে যে হঠাৎ মনে পড়ল! আজ কোন দিক দিয়ে সূর্য্যোদয় হয়েছিল রে!"

বন্ধুর বিদ্রূপের উত্তর না দিয়া বিনয় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যতার সহিত বলিল, "মনে পড়ল কি সাধে! কিন্তু তোর সঙ্গে যে একটু প্রাইভেট কথা আছে সুধীর!"

"তা'হলে এখানে নয়, ঐ ধারে চল্।"

অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে আসিয়া একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া সুধীর বলিল, "হ্যাঁ, এখন বল কি বল্‌বি, হঠাৎ এ সময় কোত্থেকে এলি, আগে তা'ই বল্ দেখি—বাড়ীতে সবাই ভাল তো?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সব ভাল। আমাদের কলেজের গরমের ছুটী হয়ে গেল কি না, তাই কদিন হ'ল বাড়ী এসেছি। তারপর তোমার কীর্ত্তির কথা শুনে আর কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলুম না। এ সব কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড করেছিস্ সুধীর? ছি! ছি!"

সুধীর অপ্রস্তুত হইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "সব কথাই শুনেছিস্? না শুধু আমাকেই দোষী মনে করে চোখ রাঙ্গিয়ে শাসাতে এলি?"

বিনয় অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে কহিল, "শুধু! শুনেছি নয় সুধীর! তোর কীৰ্ত্তি আজ স্বচক্ষেই দেখে এলুম। কিন্তু• সুধীর! তোর মন যে এমন কঠিন, তুই যে কখনো এত বড় পাষণ্ড হ'তে পারিস, তা'তো কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবিনি, তুই কি সত্যি সেই সুধীর?"

"সেই সুধীর নয় তো কি তা'র প্রেতাত্মা?"

"প্রেতাত্মাই বটে। মানুষে কি, এত বড় নৃশংসতা করতে পারে?"

সুধীর অতিষ্ঠ হইয়া বলিল, "বাপ্‌রে বাপ্‌! লেক্‌চারের জ্বালায় অস্থির করে তুল্লি যে! কি এমন দুষ্কৰ্ম্ম করেছি যা'র জন্যে একেবারে মার মুখো হয়ে ঝগড়া করতে এলি শুধু শুধু?"

বিনয় বিমর্ষ মুখে বলিল, "শুধু শুধু নয় সুধীর! এখানে আসবার সময় তো'র শ্বশুর বাড়ীতেও গিয়েছিলুম কি না, সেখানকার যা অবস্থা দেখে এলুম, তা এ জীবনে ভোলবার নয়! সত্যি সুধীর! তো'র এমন দুৰ্ম্মতি হ'ল কেন বল দেখি? বেশ তো রাজার হালে ছিলি—"

"সকলের রুচি তো সমান হয় না বিনয়!—গরীবের ছেলের ও রকম রাজার হালে থাকা সহ্য হ'ল না, তা'ই চলে এলুম। এতে এমন খণ্ডপ্রলয় বাধাবার কি দরকার ছিল?"

বিনয় বলিল, "কিন্তু তো'র শ্বশুর মশাইয়ের অবস্থা শুনেছিস তো? —ব্রাহ্মণ কি ছিলেন আর কি হয়ে গেছেন!"

সুধীর গম্ভীর হইয়া বলিল, "সব শুনেছি, কিন্তু ধৰ্ম্মতঃ বল দেখি এতে কি শুধু আমারই অপরাধ—"

"অপরাধ একশো বার! তোর নিজের ছেলেও তো হয়েছে, সন্তান যে কি বস্তু তা তো বুঝেছিস সুধীর?"

সুধীর অপরাধীর ভাবে কহিল, "কিন্তু সংসারে এমন লোকও তো ঢের আছে বিনয়, যার সম্পত্তি অগাধ, অথচ নিঃসন্তান তা'রাও তো—"

বাধা দিয়া বিনয় উত্তেজিত স্বরে বলিল, "সে আমিও জানি সুধীর! —কিন্তু যে পায় নি, আর যে পেয়েও বঞ্চিত হয়েছে, এ দুয়েতে যে প্রভেদ কত, তা বুঝতে পারছিস না? ব্রাহ্মণকে তুই কত বড় আঘাত দিয়েছিস বল তো? তিনি কত আশা, কত বিশ্বাস করে তাঁ'র যথাসর্ব্বস্ব তো'র হাতে তুলে দিয়েছিলেন, আর তুই কি না বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তাঁ'র বুকে ছুরী বসিয়ে বুকের ধন ছিনিয়ে নিয়ে এলি! আঘাতটা কি কম দিয়েছিস সুধীর?"

সুধীর মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "কিন্তু বিনয়! তুই ধর্ম্মতঃ বল দেখি, আমি এতই কি অপরাধ করেছি?—মেয়ে স্বামীর ঘর করবে—এই তো জগতের চিরন্তন প্রথা। আমাদের রাণীও তো সেই অবধি শ্বশুরবাড়ী রয়েছে, তা সে বেচারি—"

বিনয় এবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "নাঃ বাপু! তোকে বোঝান আমার কর্ম্ম নয়! এমন বোকা বুদ্ধি না হ'লে কি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারে? আচ্ছা, আর বকাবকি করে কাজ নেই, এখন বউদিকে নিয়ে শীগ্‌গির যা সেখানে—কর্ত্তার যা দশা দেখে এসেছি, কখন কি হয় বলা যায় না। আহা! কি শরীর কি হয়ে গেছে, দেখে চোখে জল রাখা যায় না! ভগবান যেন অতিবড় শত্রুরও অমন দুর্দ্দশা না করেন—"

সুধীর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সে কি? তাঁ'র শরীরও খারাপ নাকি? কিন্তু এ কথা কই শুনিনি তো?"

"খারাপ বলে খারাপ—একেবারে পক্ষাঘাত, যার অধিক দুর্ভোগ আর মানুষের হ'তে পারে না। দক্ষিণ অঙ্গটা তাঁ'র একেবারে অবশ অসাড় হয়ে গিয়েছে। একটী আঙ্গুল পর্য্যন্ত নাড়বার ক্ষমতা নেই, এম্নি দুরবস্থা!"

সুধীর চমকিত হইয়া আহত কণ্ঠে কহিল, "অ্যাঁ! বলিস্ কি? পক্ষাঘাত! উঃ! কি ভয়ানক কথা! কিন্তু এই তো সেদিন পিসীমা এসেছিলেন, কই এ রকম অসুখের কথা তো বলেননি তিনি—"

"তাঁ'র যাবার পরেই তো এই কাণ্ড হয়েছে। রোগের সূত্রপাত শরীরের ভেতরে ভেতরে অনেক দিন থেকেই হচ্ছিল, তার ওপর অনিয়ম অত্যাচারে এখন একেবারেই পেড়ে ফেলেছে। আহাঃ! ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে শেষে এতও ছিল?"

অনুতাপের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া সুধীর সজল নয়নে বলিল, "তা'হলে এখন কি হবে বিনয়?—এ যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল! ঘটনাটা যে শেষে এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াবে তা তো কখনও মনেও ভাবিনি!"

বিনয় সদুঃখে বলিল, "কি আর হবে! এখনও সময় আছে, যাও,—গিয়ে তাঁ'র প্রাণপাত সেবা করে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করগে,—আর কি বলি বল? সত্যি, কাজটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে সুধীর! বউদি নিজের কর্ত্তব্য ঠিকই করেছিলেন, কিন্তু তা'ই বলে তোমার এ রকম পাগলামী করাটা একেবারে উচিত হয়নি। যাক্ এখন আর আপশোষ করলে কি হবে, তা'র চেয়ে চল, বউদি আর খোকাকে নিয়ে আজই বেরিয়ে পড়—আর একদণ্ড দেরি করিসনি। পিসীমাকেও টেলিগ্রাফ দিয়ে এলুম। আচ্ছা এখন গুড্ বাই!"

সুধীর বিনয়ের হাত ধরিয়া আগ্রহভরে কহিল, "চল্লি নাকি! না, না, তা' হ'তেই পারে না, একবার বাসায় গিয়ে মণির সঙ্গে দেখা না কর্‌লে সে যে কত দুঃখ করবে—"

"না ভাই! বউদির সঙ্গে দেখা আমি করতে পারব না,—আমি তাঁ'র সাক্ষাতে মুখ দেখাব কোন্ লজ্জায়! এক রকমে ধরতে গেলে বউদির এই মনঃকষ্টের জন্যে আমিই নিমিত্তের ভাগী হয়ে রইলুম। কেন না, আমার ঘটকালীতেই তো'দের বিয়ে হয়েছিল। আর একদিন তাঁ'র বাপের বাড়ীতে এসেই দেখা করে যাব বউদিকে বলে দিস।"

পঁচিশ।

"আর কেন ডাক্তার? ছেড়ে দাও, যেতে দাও আমাকে, কেন আর বৃথা ধরে রাখবার চেষ্টা করছ তোমরা?"

"আপনি এরি মধ্যে এমন হতাশ হয়ে পড়লেন কেন, মিঃ ব্যানার্জী? আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যতগুলি উপায় আছে, আমি সমস্ত প্রয়োগ করে দেখব,—আপনাকে ভাল করতে পারি কি না?"

পীড়িতের অবসাদ ক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখে অবিশ্বাসের মৃদু হাসি প্রকটিত হইল। ক্লান্ত স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "এ যে দুরারোগ্য ব্যাধি ডাক্তার,—আমি কি জানি না এ বয়সে এ রোগ আরোগ্য হওয়া অসম্ভব? সব বুঝছি। তবে দুটো দিন আরো যদি আমার জ্ঞান বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ থাকে, তা'হলে এই বেলা উইল টুইলগুলো সব ঠিক করে নিই।"

রোগীর কাতরতা ও ব্যগ্রতায় চিকিৎসক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এ আপনার ভুল ধারণা, কে বলে এ রোগ আরোগ্য হবার নয়? আমি নিজের হাতে কত পক্ষাঘাত রোগীর চিকিৎসা করেছি—"

"তা'রা কি যথার্থই আরাম হইয়াছিল ডাক্তার?—আমার তো বিশ্বাস হয় না।"

ডাক্তার এবার কিছু সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। তিনি গম্ভীর মুখে সত্য কথা গোপন না করিয়া উত্তর দিলেন, "অবশ্য সকলেই যে আরাম হয়েছিল তা বলছি না, তবে যা'রা রীতিমত চিকিৎসা আর শুশ্রূষা পেয়েছে

তা'দের মধ্যে অনেকেই ভাল হয়েছে বই কি ? আপনাকে আমি নিশ্চয় সারিয়ে তুল্‌ব, মিঃ ব্যানার্জী !—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন।"

রোগী একটী বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গভীর হতাশায় কহিলেন, "আর সেরেছি !"

বেনারসের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মার্টিনের সহিত পক্ষাঘাত রোগ গ্রস্ত যোগেশ্বরের কথোপকথন হইতেছিল।

রোগীকে সান্ত্বনা দিয়া ডাক্তার কহিলেন, "কেন সারবেন না ?—নিশ্চয় সারবেন ! বিশেষতঃ আপনার রোগটা যখন দক্ষিণ অঙ্গে তখন জীবনের আশঙ্কা হঠাৎ নেই, তবে বাম অঙ্গে হলে অবশ্য বিশেষ ভয়ের কথা ছিল, কারণ তা'হলে হৃদ্‌যন্ত্রের উপর অ্যাট্যাক করতে পারত—"

বাধা দিয়া যোগেশ্বর হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসি যেন মুমূর্ষের শেষ নিঃশ্বাসের মত মর্ম্মভেদী ও করুণ !

হাসিতে হাসিতে যোগেশ্বর সক্ষোভে বলিলেন, "জীবনের আশঙ্কা নেই সেইটেই তো আরও ভয়ানক কথা ডাক্তার ! জীবন গেলে তো সব ল্যাঠাই চুকে যায়। কিন্তু এ যে বড় বিষম জ্বালা !—জীয়ন্তে মরার অধম হয়ে জড় পিণ্ডের মত পড়ে থাকা—হাত নেই, পা নেই,—এতটুকু নড়বার শক্তি নেই, দৃষ্টিশক্তি, বাক্‌শক্তি এখনো আছে অবশ্য, কিন্তু তাও কি থাক্‌বে ? দেখছ না—ক্রমশঃ জীভ্‌ যেন জড়িয়ে আসছে—চোখেও যেন কেমন ঝপ্‌সা ঝপ্‌সা দেখছি। স্নায়ুগুলোও বুঝি অবশ অসাড় হয়ে গেছে ? এরপর অনুভব শক্তিটুকুও কি থাক্‌বে না ডাক্তার ? তা'হলে ওরা যদি আসে তবে কি করে—"

বলিতে বলিতে যোগেশ্বর হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তাঁহার নিষ্প্রভ চক্ষু দুটী অশ্রুজলে চক্ চক্ করিতে লাগিল?

রোগীর প্রকৃত মর্ম্ম বেদনা বুঝিতে না পারিয়া ডাক্তার বিধি মতে তাহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "আপনি শিক্ষিত জ্ঞানবান হয়ে এ রকম অবুঝের মত মন খারাপ করছেন কেন মিঃ ব্যানর্জ্জী! আমার যতদূর বিশ্বাস ও সব লক্ষণ প্রকাশ পাবার আগেই আপনার অবস্থা ভালর দিকেই যাবে। তবে আপনি জানেন বোধ হয়, এ রোগ শরীরের নয়, মনের। মন ভাল না রাখলে অবশ্য এ ব্যাধি দুরারোগ্য হয়ে পড়তে পারে।"

যোগেশ্বর আবার একটু বুকফাটা কান্নার মত ম্লান করুণ হাসি হাসিলেন। মন ভাল রাখিতে হইবে?—হায় রে অদৃষ্ট! এই অবাধ্য অসংযত মনের দোষেই না আজ এই বিকট ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জীবন্তে মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য কবিতে হইতেছে? মন শক্ত হইলে এমন শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিবেই বা কেন?

এই যে অতি ক্ষুদ্র শিশুর চেয়েও শক্তিহীন অসহায় নিরুপায় হইয়া অনড় অবশ পাষাণমূর্ত্তির মত পড়িয়া কেবলই মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছেন,—এখনো কি পাপ মনের মায়ামোহ কাটিয়াছে?

জ্যোতির্হীন অপলক দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতেছে কেবল সেই অশ্রুভরা কোমল মুখখানি,—নিয়ত উৎকর্ণ শ্রবণ দুটীতে বাজিতেছে সেই স্নেহ ভক্তি বিগলিত মধুর আহ্বান বাণী। মুক্তি! মুক্তি! হায় রে মুক্তি কোথায়? যাহার মনে এখনও এত মমতা এত আকাঙ্ক্ষা ভরা, সেই ঘোর মায়াবদ্ধ পাপ আত্মার মুক্তির আশা যে বাতুলতা মাত্র। হায় গুরুদেব! তোমার এত দিনের যত্ন ও চেষ্টা সমস্তই নিস্ফল হইয়া

গেল! বৃথা, বৃথা এত দিন সাধনার নামে ছলনা করিয়াছি। মাগো ব্রহ্মময়ী! জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে তোমার অধম ভক্তকে ক্ষমা করো মা! এখনও তা'র জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত কর! মুক্তি দে মা! মুক্তি দে!

ভুল ভুল! সমস্তই ভুল। যোগেশ্বর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য অবোধের মত আগাগোড়াই ভুল করিয়া আসিয়াছেন, সেই ভুলেরই বুঝি এইবার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে!

যোগেশ্বর তাঁহার বাম হাতখানি দিয়া ডাক্তারের একখানা হাত আগ্রহভরে চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "ডাক্তার! আমার একটা উপকার করতে পারো?"

তাঁহার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া কোমল অনুনয়ের ভাবে বলিলেন, "আমাকে কি করতে হবে, অসঙ্কোচে বলুন, মিঃ ব্যানার্জী, আমি আমার সাধ্যমত আপনার উপকার করতে প্রস্তুত আছি।"

"বেশী কিছু নয়, শুধু এক ফোঁটা ওষুধ,—তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এমনও তো ওষুধ আছে, যা এক ফোঁটা দিলেই আমার সকল জ্বালা, সব ভাবনা নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়,—তবে দয়া করে তাই দাও না কেন? হতভাগ্যকে এ ভাবে বাঁচিয়ে রেখে, আর কি হবে বল?"

সে কথায় সে সুরে ডাক্তারের কঠোর প্রাণও বিচলিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, "আপনি এ সব কি বাজে বক্‌ছেন, মিঃ ব্যানার্জী? এমন করে মিছে অসুখটা না বাড়িয়ে, একটু স্থির হয়ে থেকে, আমাকে আমার কর্ত্তব্য কাজ করতে দিলে বড় বাধিত হ'ব। জগতে চেষ্টার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই জানেন তো?"

যোগেশ্বর আর কিছু বলিলেন না। বোধ হয় শ্রান্ত হইয়াই চক্ষু মুদিলেন।

রোগীকে নিদ্রিত মনে করিয়া ডাক্তার সাহেব সতর্ক পাদক্ষেপে ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। পীড়িতের পরিচর্য্যার জন্য শুশ্রূষাকারিণী নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বিনিদ্র যোগেশ্বর তখন নিমীলিত নয়নে ভাবিতেছিলেন, এখনো কি জানি কত দিন কতকাল আরো এমনি অবশ অসাড় ভাবে জড়ের মত পড়িয়া থাকিতে হইবে!

ধীরে ধীরে পলে পলে জীবনী শক্তি ক্ষয় হইয়া কি জানি কত দিন, কত রাত্রি, কত দীর্ঘ দীর্ঘতর কাল মরণের আশাপথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে!

ভাবিতে ভাবিতে একসময় চিন্তাদগ্ধ যোগেশ্বর তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সেই তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন তাঁহার মণি, তাঁহার প্রাণাধিকা স্নেহের দুলালী মণিকা যেন সত্যই আসিয়াছে। পিতার এই নিদারুণ দুরবস্থা দেখিয়া সে দুঃখে ক্ষোভে আকুল হইয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছে।

যোগেশ্বর সে দৃশ্য সহিতে না পারিয়া অতি মাত্র অধীর ব্যাকুল কণ্ঠে স্বপ্ন ঘোরেই বলিয়া উঠিলেন, "মণি!—আমার মণি মা গো!"

শিয়রের দিক হইতে কে অশ্রু কম্পিত সকরুণ স্বরে বলিল, "বাবা! বাবা"!

বিস্মিত যোগেশ্বর চক্ষু মেলিয়া অশ্রুমুখী দুহিতার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন—ইহা কি স্বপ্ন না সত্য ঘটনা? ব্যথাহতা মণিকা পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিল, "বাবা

একবার কথা কও বাবা, আমি যে বড় আশা করে তোমার পায়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

এ কি স্বপ্ন নয় তবে, সত্যিই কি তুই এলি মা? সত্যি? তবে এদিকে আয় মা! আমার বুকের কাছে সরে আয়, আমার যে একটু নড়বার শক্তি নেই মা!"

মণিকা পিতার বক্ষের উপর মূর্চ্ছিতের মত লুটাইয়া পড়িয়া সরোদনে বলিল, "মেয়ের ওপর রাগ করে এমনি করেই কি প্রতিশোধ নিতে হয় বাবা? আমি যে জন্মের মত অপরাধী হয়ে রইলুম, এ মহাপাপের যে প্রায়শ্চিত্ত নেই বাবা!"

"না মা! রাগ করব কেন? তুই যে আমার লক্ষ্মী—আমার সাবিত্রী-রূপিনী মা।"

মণিকার পিঠের উপর বাম হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে যোগেশ্বর অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "সন্তানের ওপর রাগ অভিমান করে কি থাকা যায় মা? রাগ নয়, তবে দুঃখ খুবই হয়ে ছিল। বুকের ভেতর যেন দিনরাত রাবণের চিতা জ্বলছিল। সে আগুন কিছুতেই নিভাতে পারিনি মা! আমার সমস্ত চেষ্টা সব শক্তি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে! মহামায়ার মায়াজাল ছিন্ন করা কি আমার সাধ্য মা?

কিন্তু আমার দাদা মণি কোথায় মা? তাকে আননি?"

"এনেছি বই কি বাবা, ঐ যে সে গিন্নিঝির কোলে।"

খোকাকে কর্ত্তার সম্মুখে আনিয়া গিন্নিঝি চক্ষের জল কষ্টে রোধ করিয়া বলিল, "এই নাও কর্ত্তাবাবু গো! তোমার ছিষ্টিধর বংশধরকে বুকে তুলে নাও, বুকটো জুড়ুক একটু। আহা! দিদি মণি! সেই তো

এলে, দুটোদিন আরো এগিয়ে আস্‌তে যদি তা'হলে বাপের আর এ দশা দেখতে হ'ত না গো! আসবে না, আসবে না ক'রে ব্রাহ্মণ একেবারে অত বড় শরীরখানা পাত করে ফেল্লেন।"

"দাদা মণি আমার! সোণার যাদু আমার!—এতদিন পরে তোমার পাগল দাদার আঁধার ঘর আলো করতে এলে মাণিক?"

বিস্মিত অবাক্ শিশুকে বক্ষে চাপিয়া যোগেশ্বর অশ্রু বিগলিত নয়নে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, "আর আমার মরণেও দুঃখ নেই, আমার হারানিধি আজ ফিরে এসেছে! সরকারকে নৈহাটীতে একখানা টেলিগ্রাম করে দিতে বল তো গিন্নিঝি! দিদি আমার ওপর রাগ অভিমান করে চলে গেছেন। কিন্তু সুধীর কই? তাকে তো দেখছি না।"

গিন্নিঝি বলিল, "ওই যে ওধারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুম ভাঙ্গবার ভয়ে ঘরে আসেনি। আহা! শোকটা তা'রও প্রাণে বড় লেগেছে, খালি চোখের জল মুছে মুছে চোখ দুটো যেন জবাফুল করে তুলেছে। যাই আমি ডেকে দিই গে।"

শুশ্রূষাকারিণী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া এই অপরূপ স্নেহের অভিনয় দেখিতেছিল, এই পরিপূর্ণ মিলন আনন্দে বাধা প্রদান করিতে যেন তাহার সাহস বা প্রবৃত্তি হইতেছে না। সে দৃশ্য বড়ই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। ঘরে ঢুকিয়াই সুধীর রোগীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া প্রথমে বজ্রাহতের মত থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণে যোগেশ্বরের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া সে করুণার্দ্র ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমাকে ক্ষমা করুন। না বুঝে আপনার স্নেহের অবমাননা করে আমি মহা—মহাপাপ করেছি বাবা, অবোধ সন্তানের সমস্ত ত্রুটী সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

জামাতাকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া যোগেশ্বর পুলকিত ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "ক্ষমা আমি আগেই করেছি বাবা, তোমাদের অপরাধ কি? অপরাধ আমার নিজের,—আমি যে ধন গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে, বাৎসল্য স্নেহে, অন্ধ হয়ে ভুলে গিয়েছিলুম যে আমি **মেয়ের বাপ**।"

শেষ।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়

"চুঁচুড়ার কিনারায় যাঁর পীঠস্থান
হৃদয় ক্ষীরের খনি আকারে পাঠান।
হাঁসারঙা খাসা বুড়ো মাথা জ্ঞানগুড়ে
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে।
ইংরাজী শিক্ষার ফুল বাঙ্গালী শিকড়ে
স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে।
তর্কেতে তক্ষক যেন তেজে তেজপাতা
শিক্ষাব্রত সিদ্ধকাম শিক্ষকের মাথা।
বচন বটের ফল ধীরে ধীরে পড়ে
দেশের দোছোট বটো—মোদ্দা কথা গড়ে
ধনে মানে কুলে যশে পদে পাকা তাল
সেকালের মাঝে এক সুন্দর প্রবাল।
নবগ্রহ পূজাকালে আগে যার ভাগ
দেখো হে পুতুল রাজা বাঙ্গালীর বাঘ।"

৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

"সুভব্য ভূদেব-বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন।
গুরু-মহাশয়-গুরু শুভ-দরশন॥
বঙ্গদেশ সাহিত্যের উন্নতি সাধক।
কাটিছেন সযতনে অজ্ঞান কণ্টক॥" ৺দীনবন্ধু মিত্র।

বঙ্গীয় গগনের গৌরবরবি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বঙ্গ সাহিত্য ও সমাজের শিক্ষাগুরু, প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া বাঙ্গালীকে দিতে হইবে না। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের আদিযুগে বঙ্গদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে যখন দারুণ সংঘর্ষ বাঁধিয়াছিল, পরধর্ম্মের বিপুল মোহে স্বধর্ম্ম যখন বাঙ্গালীর চোখে নিতান্তই দরিদ্র, ম্লান বলিয়া অনুভূত হইতেছিল, দেশের দুর্দ্দিনে যখন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই বিজাতীয়ভাবের অনুকরণে বিভোর হইয়াছেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন বাঙ্গালা জানেন না বলিতে গৌরব বোধ করেন, সেই শঙ্কট সময়ে চরিত্রের অটল মহিমায় প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তিতে যিনি জাতীয়তার বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন—আমাদের আচার, নীতি, আদর্শের গভীর মহিমা সুদৃঢ় যুক্তির সহাতায়

বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়াছিলেন ;—ভারতে নবযুগের আদি প্রবর্ত্তক, স্বদেশী-মন্ত্রের আদি পুরোহিত, শক্তিশালী বাঙ্গালীর পবিত্র রচনাবলী বাঙ্গালী হইয়া যিনি না পড়িলেন, তাঁহার বাঙ্গালী জীবনই বৃথা হইল। আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ দেশভক্ত এবং আদর্শ জ্ঞানীর এরূপ একত্র সমাবেশ জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শিক্ষার প্রচার, সমাজের উন্নতি এবং জাতীয় গৌরবের স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি জীবনপাত করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার আজীবনের সঞ্চয় হইতে একলক্ষ ষাটি হাজার টাকা শিক্ষা লোকষার্থে ও আর্ত্তের সাহায্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা, সমাজ, আচার বিষয়ক পুস্তকাবলী, তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক মধুর সমালোচনা, তাঁহার 'পুষ্পাঞ্জলি', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালার গৌরবের বস্তু। তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা, স্বজাতি প্রীতি, অপূর্ব্ব চরিত্র, উদার বিচার বুদ্ধি তাঁহাকে স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্ব-পূজ্য করিয়াছে। তিনি রাজকীয় সি, আই, ই, উপাধি পাইয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন, বঙ্গবিহারের স্কুল পরিদর্শকরূপে বহু কৃতীত্ব দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু এ সমস্ত তাঁহার গৌরব নহে। তাঁহার গৌরব তিনি স্বজাতিকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, দেশে একতা আনিবারা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিহার প্রদেশের আদালত সমূহে হিন্দিভাষা প্রচলন প্রবর্ত্তন করাইয়াছিলেন। সামাজিকতায় হিন্দুমুসলমান খৃষ্টানে যিনি কোন দিন ভেদ করেন নাই—ঋষির তুল্য নৈষ্ঠিক, জ্ঞানী ভূদেবের জ্ঞানের ফল,অমূল্য গ্রন্থরাজি বাঙ্গালী পঞ্জিকার মত গৃহে গৃহে রক্ষ করুন। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হউক।

———

প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত ঃ—

পারিবারিক প্রবন্ধ

বাঙ্গালী পাঠককে পারিবারিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; উহা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সমাদৃত। যিনি জীবনকে শান্তিময়, সুখময় করিতে চাহেন—গৃহ হইতে নানা প্রকার অশান্তি, বিদ্বেষ, হীনতা দূর করিতে চাহেন, তিনি এ গ্রন্থ পাঠে প্রভূত সহায়তা পাইবেন। লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কিরূপ ভাবে চলিলে মানুষ উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইতে পারে, তাহার পক্ষে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না, আমাদের এই পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ তাহা নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার পরম স্নেহের দেশবাসীর কল্যাণ জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দাম্পত্য-প্রণয়, উদ্বাহ-সংস্করণ, সতীর ধর্ম্ম, সৌভাগ্য-গর্ব্ব, দাম্পত্য-কলহ, লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপনা, কুটম্বিতা, পিতামাতা, সন্তানের শিক্ষা, পুত্রকন্যার শিক্ষা, পুত্রবধূ, রোগীর সেবা, চাকর প্রতিপালন, পশু পালন, অতিথি-সৎকার, স্ত্রীশিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, ভাইভগিনী, শিক্ষাভিত্তি, কাজকরা, অর্থসঞ্চয়, শয়ন, নিদ্রা, ভোজন, গৃহশূন্যতা, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ প্রভৃতি বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে।

স্বর্গীয় **বঙ্কিমবাবু** এই পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থকারের অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা প্রসূত। কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য অধিক হয়, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পাঠ্য এমন সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই।"

"আমার জীবনে যে সকল ভুল করিয়াছি, দশবৎসর পূর্ব্বেও এই পুস্তকখানি পাইলে তাহার অনেকগুলি হইতে রক্ষা পাইতাম।"

—৺চন্দ্রনাথ বসু।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার, উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, সুন্দর স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই, মূল্য ১৸৹ (এক টাকা বার আনা)।

সামাজিক প্রবন্ধ।

ভারতের নবযুগ-প্রবর্ত্তক এই গ্রন্থপাঠ না করিলে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। আত্ম-কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহা পাঠ করিবেন। এই মহামূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশে এক নবভাবের উদ্দীপনা জাগিয়াছিল। একটী মাত্র সমালোচনা পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এসিয়াটিক সোসাইটীর রিপোর্টে সার চার্লস ইলিয়ট লিখিয়াছিলেন—"এ দেশে আর একখানিও পুস্তক নাই যাহাতে—"সামাজিক প্রবন্ধের" ন্যায় এতটা পাণ্ডিত্য এবং এতটা বহুদর্শিতা একত্রে আছে। প্রগাঢ় প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য বিদ্যার সমবায়ে সমুৎপন্ন।"

ভারতবর্ষে মুসলমান, হিন্দু সমাজ, ইংরাজ সমাগম, ইউরোপের কথা, ভারতবর্ষের কথা, নেতৃপ্রতীক্ষা, কর্ত্তব্য নির্ণয়, ভবিষ্য বিচার, জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের পথ প্রভৃতি ৩৯টী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইহাতে আছে। ইংরাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র, টেলিগ্রাম প্রভৃতি বিদ্যা বিস্তারের উপাদান প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এই পুস্তকখানি সেই কর্ত্তব্য অবধারণে সহায়তা করিবে, এই উদ্দেশ্যেই লিখিত।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ১॥৹ টাকা মাত্র।

আচার প্রবন্ধ

এ দেশের জলবায়ুর উপযুক্ত এবং অল্প আয়াস ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য কিরূপ বিধি পালন করিলে শরীর এবং মনের দৃঢ়তা, পটুতা ও উদারতা বৃদ্ধি হয় এবং সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় এবং কিরূপে এই জীবন সুখের হইতে পারে, তাহা এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সকলেরই পক্ষে ইহা একান্তই প্রয়োজনীয় পুস্তক।

উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

কলিকাতা রিভিউ বলেন—৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু অর্থ দান করিয়া জন্মভূমির অশেষ হিতের উপায় করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক ও আচার প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাজী রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি তজ্জন্য স্বদেশবাসীগণের নিকট বহুগুণ অধিক কৃতজ্ঞতার ভাজন।

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব

এ পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের, ছাত্রদিগের এবং তাহাদিগের অভিভাবকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়। গ্রন্থকার একজন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষক। বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে এবং পরিবার মধ্যে ছাত্রবর্গের যে প্রকারে প্রতিপালন হওয়া আবশ্যক, সে বিষয়ে অনেক কথা এই পুস্তকে পাওয়া যায়। অধিকন্তু শিক্ষাদান (Art of Teaching) কার্য্যে পারদর্শী হইতে হইলে এ গ্রন্থখানির সাহায্য

লওয়া অপরিহার্য্য। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

——:❋:——

বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ)

এই গ্রন্থে এই তিন খানি সংস্কৃত নাটকের—উত্তর চরিত, মৃচ্ছকটিক ও রত্নাবলীর—সুন্দর সমালোচনা আছে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যালোচনা—Literary criticism এর চূড়ান্ত নিদর্শন। সংস্কৃত-সাহিত্যের তিনখানি শ্রেষ্ঠ নাটকের সৌন্দর্য্য কোথায়, তাহার সুনিপুণ বিশ্লেষণ দেখিয়া কাব্য সৌন্দর্য্য নূতন করিয়া অনুভব করিবেন। নাটকীয় চরিত্রগুলি কিরূপভাবে বিশ্লেষিত হইলে নাটকের রস উপভোগে সহায়তা করে—স্বর্গীয় ভূদেববাবু তাহা প্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসেবীগণের এই পুস্তক পরম আদরের ধন।

ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি আকার, উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য এক টাকা।

বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ)

মনুষ্যসৃষ্টি, মানবজাতির সহিত দেবতার সম্পর্ক, ভাষার পর্য্যায়ক্রম, লিপির পর্য্যায়ক্রম, বাঙ্গালী সমাজ, বঙ্গ সমাজে অন্তঃশাসন, বাঙ্গালীর উদ্যম-হীনতা, অধিকারীভেদ ও স্বদেশানুরাগ, সন্তানোৎপত্তি, তন্ত্রশাস্ত্র, তন্ত্রের যাবতীয় কথা এবং সাধন প্রকরণ, যুদ্ধ প্রণালী, স্বাধীন বাণিজ্য, শান্তি ও সুখ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ৭১ টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি পাণ্ডিত্যে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে—অথচ এমনি সহজ ও প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে লেখা যে কোথাও বুঝিতে কষ্ট হইবে না। অবিশেষজ্ঞ পাঠকও এই বিবিধ প্রবন্ধের রস সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায়

উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। প্রবন্ধ গৌরবে অতুল্য গ্রন্থ। মূল্য এক টাকা।

——:০:——

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস

ভারতের উন্নতির প্রকৃত ঐতিহাসিক পথ কি তাহা এই পুস্তকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কল্পনার সহিত স্বদেশ-প্রেমের এমন মিল বাঙ্গলার আর কাহারও কোন রচনায় মিলিবে না। প্রতিভার এ এক অপরূপ কীর্ত্তি!

"৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা এবং চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই অসাধারণ মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের অনুরূপ। সেই আলোচনা ও চিন্তার ফল **"স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস।"** এই পুস্তকখানি তিনি নিদ্রিত অবস্থায় লিখিয়াছিলেন। তিনি নিজে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, পড়িয়া দেখুন:—

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে উঠিয়া দেখি, কয়েক খণ্ড কাগজ আমার শিরোদেশে রহিয়াছে। তাহার লেখা দেখিয়া কখন বোধ হয় আমার নিজের হাতের লেখা হইবে, কখন বোধ হয় আমার না হইতেও পারে। নিদ্রাবস্থাতেও যে কেহ কেহ কখন জাগ্রতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহার অনেক উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। যাহা হউক্, শাস্ত্রে বলে স্বপ্নলব্ধ ঔষধ এবং উপদেশ কদাপি অগ্রাহ্য নহে। শাস্ত্রানুবর্ত্তি কার্য্য করাই উচিত বোধে এই **"স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস"** প্রচার করিতে দিলাম।

"পাঠক পাণিপথ যুদ্ধে যদি মহারাষ্ট্রীয়দিগের জয় হইত, হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ যদি তিরোহিত হইত, মহারাষ্ট্র-সম্রাট যদি বাছা বাছা

বিদ্বান্ বিজ্ঞ হিন্দু-মুসলমান মন্ত্রী লইয়া সাম্রাজ্য চালাইতেন, ভারতের আর যত রাজ্য যদি এই ব্যবস্থায় অনুমোদন ও সাহায্য করিতেন; ভারতের যদি এইরূপে একতা বন্ধন হইত, এবং একতা-বন্ধনে যদি বল বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থায়ই ভারতের হইতে পারিত না? আভ্যন্তরিক বিবাদ বিসম্বাদই দুর্ব্বলতার হেতু। মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানষ চক্ষে ভারতের ভাগ্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ভারত কি হইতে পারিত, কি হইয়াছে, তাহা দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ভারতের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। পুস্তকখানির নমুনা স্বরূপ কয়েকটি স্থান মাত্র উদ্ধৃত করা হইল।"
—দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা। মূল্য আট আনা মাত্র।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বাঙ্গলা ভাষায় এই পুস্তক খানি সর্ব্ব প্রথম উপন্যাস। ইহার ভাষা ও ভাবের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটী অধ্যায়ও আয়ত্ত হইয়া যায়। ইহা বালক-বালিকাদিগকেও নিঃসঙ্কোচে পড়িতে দেওয়া যায়। ইহার '**অঙ্গুরীয় বিনিময়**' নামক গল্পটী পড়িয়া দেখুন, কিরূপ পবিত্র ও মনোহর। ইহাতে দুইটী স্বতন্ত্র উপন্যাস দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গালায় প্রথম ও বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া ইহার আদরও যথেষ্ট।

আজকালিকার উপন্যাস পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ 'দাদা-মহাশয়ের যুগের' এই উপন্যাসে যথেষ্ট রস, উদ্দীপনা, কৌতুক ও আমোদ উপভোগ করিবেন এবং তৎসঙ্গে স্বদেশহিতৈষিতাও লাভ করিবেন। মূল্য আট আনা।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

গরিবের মেয়ে (উপন্যাস) ৩৲

হারাণো খাতা (উপন্যাস) অতুলনীয় গ্রন্থ, আধুনিক যুগের উপযোগী (বাঁধান) ২৷৷০

জোয়ার ভাঁটা (উপন্যাস) দেশী [illegible]র অপূর্ব্ব সম্মেলন (বাঁধান) ১৷৷০

শিশু মঙ্গল (প্রবন্ধ) ৵০

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

মেয়ের বাপ (উপন্যাস) হিন্দু পরিবারের করুণ চিত্র (বাঁধান)

ফল্গুধারা (উপন্যাস) ব্যর্থ প্রেমের গোপন চিত্র (বাঁধান)

৺ইন্দিরা দেবী

শেষদান (গল্পের পুস্তক) লেখিকার শেষ পুস্তক (বাঁধান) ১৷৷০

রায় বাহাদুর পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

কুমারী তরুদত্তের জীবনী বিদুষী বঙ্গবালার অপূর্ব্ব কাহিনী ৷৵০

কুমারী দ' আরভরসের দৈনিক আলেখ্য (উপন্যাস) কুমারী তরুদত্তের ফরাসী উপন্যাস "মামসিল দি আরভরসের" বঙ্গানুবাদ (বাঁধান) ২৲

কৃতকৃত্যতা (Laws of Success) উন্নতির উপায়, নূতন ধরণের পুস্তক (বাঁধান) ৫৲

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সাহা

সতীর পতি, আলেয়ার আলো (দুইখানি উপন্যাস) (বাঁধান) ১৲

ভস্মাচ্ছন্ন প্রকৃতি (প্রবন্ধ) ৵০